প্রমথ চৌধুরী

আ ত্ম ক থা

প্রমথ চৌধুরী

আত্মকথা

AMARBOI.COM

মনফকিরা

ভূমিকা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৭
কৈফিয়ত। প্রমথ চৌধুরী ৯

আ ত্ম ক থা
১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ ১৩ - ৭৮

আ ত্ম ক থা
সংযোজন
১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের পাঠ ৭৮ - ১০৬

পুস্তক প্রসঙ্গ ১০৫

AMARBOI.COM

ভূ মি কা

অল্পায়ু 'রূপ ও রীতি' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'আত্মকথা' নাম দিয়ে তাঁর প্রথম জীবনের যে-স্মৃতিকথা লিখছিলেন, গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ হল। বাঙালি পাঠকের আনন্দের কারণ। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সাময়িক কৌতূহল মিটিয়ে লোপ হওয়ার লেখা এ লেখা নয়।

যে-প্রমথ চৌধুরীকে দেশের শিক্ষিত সমাজ জানে, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যে নব রীতির প্রবর্তক, বুদ্ধির বিদ্যুৎদীপ্ত পরিহাস-রসিক 'বীরবল', 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদক ও লেখক, যাঁর চমক লাগানো বাক্‌চাতুরী সংস্কারলেশহীন দৃঢ় ঋজু মনের সহজ বাঁকা বহিঃপ্রকাশ— এই আত্মকথা সেই প্রমথ চৌধুরীর মন ও ভাষার ভিত্তি গড়নের ইতিহাস। প্রমথবাবুর লেখার যারা পাঠক, তারা এ বই সাদর কৌতূহলে পড়বে। আর আমার মতো যারা তাঁর সাহিত্য-শিষ্য, এবং জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আজকের বাংলা সাহিত্যে তাদের সংখ্যা কম নয়, এ আত্মকথা তাদের পরম আনন্দের সামগ্রী। প্রমথ চৌধুরী সেই লেখক, যাঁর পাঠকের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে হবে বেশি। তাঁর রচনার প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম মননশীলতা, কুজ্ঝটিকাশূন্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে-শিক্ষিত সমাজকে যথার্থ সাহিত্যিক আনন্দ দেয় তার পরিধি বর্তমান বাংলাদেশে সংকীর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এ পরিধির বিস্তার যেমন বাড়তে থাকবে প্রমথ চৌধুরীর লেখার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যাও বেড়ে চলবে। ভবিষ্যতের সেই পাঠকেরা, যারা প্রমথবাবুকে চোখে দেখেনি, এই আত্মকথা অতি মূল্যবান জ্ঞান করবে।

কিন্তু সাহিত্যিকের আত্মকথা হিসাবেই এ বইয়ের আকর্ষণ নয়। এ আত্ম-কাহিনীতে যে-সব ঘটনা ও লোকের বর্ণনা আছে তা এমন নিপুণ রেখায় আঁকা, এমন কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল যে নিজ গুণেই তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময়ে রহস্য করে বলেছি যে, ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে প্রমথবাবু চার কোটি লোককে চেনেন। এবং যার সঙ্গেই

AMARBOI.COM

তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও ভাবভঙ্গি তাঁর মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে ছড়ানো রয়েছে। এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোট গল্পের মতোই তীক্ষ্ণ ও রসাল।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা আত্মকথার ভূমিকা লেখা যে আমার পক্ষে কত বড় ধৃষ্টতা, এবং সম্ভব এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের পক্ষেই ধৃষ্টতা— তা জানি। কিন্তু তবুও প্রকাশকদের প্রস্তাব অস্বীকার করিনি। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সাহচর্য আমার জীবনের বড় সম্পদ। তা না-ঘটলে সম্ভব জীবিকার্জনের উৎসাহে, লোকে যাকে বলে 'কাজ', তাতেই ডুবে যেতাম। আমি বাংলা সাহিত্যে দু-ছত্রের নগণ্য লেখক। কিন্তু সে লেখাও লিখতেম না প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় না-হলে। এককালে যে-নবীনের দল প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে ও উপদেশে 'সবুজ পত্র'-এ লিখে লেখক হবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সকলের হয়ে এই উপলক্ষে আমাদের গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

AMARBOI.COM

কৈ ফি য় ত

বছর তিন-চার আগে আমার যুবক বন্ধুরা— যথা, বুদ্ধদেব বসু, অজিত চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে আমার আত্মকথা লেখবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমি তাতে প্রথমত রাজি হইনি; কারণ আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হবে। শেষটা আমি নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হয়ে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের নবপ্রকাশিত 'রূপ ও রীতি' নামক পত্রিকায় আত্মকথা লিখতে শুরু করি।

আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করি অতি দুঃসময়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত। পরে তিনি সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। তারপর ১৯৪১ সালে উপর্যুপরি আমার নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমত উক্ত সালের জুন মাসে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ বিমানযুদ্ধে ইংলন্ডে মারা যায়। তারপর ৭ অগস্টে আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার কিছু দিন পরে ২ অক্টোবর তারিখে আমার শাশুড়ি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাঁর আশ্রয়ে বাস করতুম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। তার বছরখানেক পূর্বে তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপ্রত্যাশিত রূপে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ করে মারা যান। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিলেন। তদবধি আমার শাশুড়ির সম্পূর্ণ স্মৃতিবিলোপ ঘটে। তার কিছু কাল পরে আমি কলকাতা ত্যাগ করে, পৌষমেলার অব্যবহিত পূর্বে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে চলে আসি— জাপানি আক্রমণের ভয়ে। এবং আজ পর্যন্ত এখানেই আছি।

মধ্যে গ্রীষ্মকালে দু-মাসের জন্য কলকাতায় ফিরে যাই। তারপর জুনের শেষাশেষি আবার চলে আসি।

আমি কলকাতা থাকাকালীন বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ এবং স্বীকৃত হই। এখন ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নদেহে

শান্তিনিকেতনে বসে গত শ্রাবণ মাস থেকে উক্ত কাগজের সম্পাদনা পাঁচজনের সাহায্যে যথাসাধ্য সম্পন্ন করছি। ইতিমধ্যে গত শ্রাবণ পর্যন্ত 'রূপ ও রীতি'তে আমার আত্মকথা মাসের পর মাস প্রকাশ করেছি। তারপর সে পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল, আমার আত্মকথাতেও ছেদ পড়ল। লোকমুখে শুনতে পাই যে, সে কথা সম্বন্ধে কৌতূহল পাঠকসমাজে আজও আছে। তাই ভরসা করে বিশ্বভারতী পত্রিকায় তার জের টানতে প্রবৃত্ত হলুম।

এক-এক সময়ে ভাবি যে, আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, কোন্ পদ্মাপারে আমার দেশ, আর এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সে কোথায় উত্তর-রাঢ়ে অর্ধেক মরুভূমির দেশে ঘটনাচক্রে এসে আশ্রয় নিয়েছি!

আমি বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তাঁর কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ত প্রকাশ করি। তাতে যত দূর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই। বঙ্কিম আমাদের নববঙ্গসাহিত্যে নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখেননি। সর্বপ্রথমে আমার যা বিশেষ করে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। এ বই অতি চমৎকার বই। উক্ত প্রবন্ধে আমি বলি যে, এ বইয়ের ভাষাকে সাত্ত্বিক ভাষা বলা যেতে পারে। তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত এইটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এ-ও রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়। তারপর কবি নবীন সেনের 'আমার জীবন' প্রকাশিত হয়। এই বইখানি সেনমহাশয়ের জীবনচরিত হলেও একখানি নভেল-বিশেষ। আর সেনমহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

আমি ছেলেবেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আত্মজীবনী পড়ি; তার দু-চার কথা আমার এখনও মনে আছে। তিনি লিখেছেন, তাঁর বাল্যজীবনে—

দেলদুয়ারে হচ্ছে জ্বরের মালখানা
বাবুরা দিচ্ছে সাগুদানা—

আর তাঁর বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে, তিনি কর্তার ঘোড়া দেখলে ঘোমটা টানতেন। তারপর অন্য একটি মহিলার লিখিত আর-একখানি আত্মজীবনচরিত পড়েছি। সেটি ঢাকা জেলার জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা-লিখিত কেশববাবুর সমাজের ব্রাহ্মদলভুক্ত হবার এবং তার সামাজিক ক্রিয়া-

AMARBOI.COM

প্রতিক্রিয়ার আনুপূর্বিক ও মনোজ্ঞ বিবরণ। এর থেকে আমার মনে হয় যে, বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা— তা-ও পূর্ববঙ্গের।

উক্ত প্রবন্ধে আরও বলি যে, পাঁচ থেকে শুরু করে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জীবনের অধিকাংশ স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সেই সব লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার করে আত্মজীবনী লিখতে হলে Goethe-র মতো তার নাম দিতে হয় 'সত্য ও মিথ্যা'। তবে মনে হয় যে, নিজের জীবনে অতীত বলে কিছু নেই। যা আছে, তা একটি প্রকাণ্ড বর্তমান। যদিচ বর্তমান বলে একটি মুহূর্তও নেই। যাকে আমরা বলি বর্তমান, সে হচ্ছে অতীত এবং ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক সন্ধিক্ষণ মাত্র।

আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করে অবধি যে সূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাকে আবার জোড়া দিতে একটা গিঁঠ দিতে হল। এখন থেকে যা লিখব, এই গিঁঠটি হচ্ছে তার প্রস্থানভূমি।

প্রমথ চৌধুরী

শান্তিনিকেতন, ১৯৪২

AMARBOI.COM

যশোর

আমার জন্ম হয় যশোরে, যদিচ আমার বাড়ি হচ্ছে পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। বাড়ি বলতে আমি সেই স্থানই বুঝি, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস।

এককালে বাঙালিরা গ্রামেই বাস করত। ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই জনকতক লোক পাড়াগাঁ ত্যাগ করে পাড়াগেঁয়ে শহরে বাস করতে আরম্ভ করলেন— ইংরেজের চাকরির খাতিরে। আমার পিতাও ছিলেন এই দলের একজন।

এই সব নতুন শহরে তাঁরা অবশ্য শিকড় গাড়েননি, কারণ ইংরেজের চাকরি করতে হলে ক্রমান্বয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে বদলি হতে হয়। সরকারের চাকর সব যাযাবরের দল।

আমার জন্মস্থানের বিষয় আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। আমি পাঁচ বৎসরে যশোর ত্যাগ করে নদীয়া জেলায় আসি। সুতরাং যশোরের স্মৃতি আমার অস্পষ্ট। সে শহরের একটি বাড়ি ও দু-একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। এর বেশি কিছু নয়।

সেই বাড়িটির কথা আমি বলব— কারণ আমার শৈশবস্মৃতি সব সেই বাড়ির সঙ্গে জড়িত।

যে-বাড়িতে আমরা থাকতুম, সে বাড়ির নাম পণ্ডিতের বাড়ি। বাড়িটি দ্বিতল আর সুমুখে একটি পুকুর ছিল। পুকুরের ওপারে একটি একতলা বাড়ি ছিল সেটি নাকি পিরালীবাবুদের বাড়ি। তার পাশ দিয়ে গিয়েছিল একটি ছোট কাঁচা রাস্তা। আর আমাদের বাসার দক্ষিণে পড়ে ছিল খানিকটা মাঠ, সেই মাঠ পেরিয়ে যেতে হত একটি রাস্তায়, যে-রাস্তা দিয়ে নাকি শহরে যেতে হয়। শহরে মাত্র আমি একটি দিন গিয়েছিলুম— শহরে আগুন লেগেছিল তাই দেখতে, চাকরদের সঙ্গে। এ অগ্নিকাণ্ডের কথা আমার মনে আছে।

আর মনে আছে একদিন দুপুরবেলা বাড়ির সুমুখের পুকুরে একটি

AMARBOI.COM

পিরালী-বাবু দুটি স্ত্রীলোকের কাঁধে হাত দিয়ে স্নান করতে এলেন। এ ব্যাপারে মহা গোলমাল হতে লাগল, কারণ শুনলাম, তিন জনই নাকি সমান মাতাল। পাছে তারা ডুবে মরে— তাই লোকজন সব চেঁচাচ্ছে। কিন্তু তারা স্নান করে উঠে গেল। বাবুটির চেহারা আমার আজও মনে আছে। তাঁর রং ছিল দিব্য গৌর বর্ণ ও শরীর দোহারা। কিন্তু দুটি স্ত্রীলোকের আর যে-গুণই থাক, রূপ ছিল না। যদি থাকত, তা হলে পিরালীবাবুর চেহারার মতো তাদের চেহারাও আমার চোখে পড়ত। আমার যত দূর মনে পড়ে, তাদের মতো কালো কুৎসিত ও রোগা স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায় না।

আমি যশোর শহরের কোন দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিনি, তার কারণ বোধ হয় সেখানে দেখবার মতো কিছু ছিল না। এই সব ভুঁইফোঁড় শহরে থাকে শুধু হাল আমলের আদালত, থানা, ইস্কুল ও জেলখানা। আমি যশোরের জেল শুধু বাইরে থেকে দেখেছি। আমার বয়েস যখন চার ও পাঁচের মধ্যে, তখন হরিপুর থেকে নৌকো এসেছিল আমাদের পুজোর সময় বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার এই পর্যন্ত মনে আছে যে, সন্ধ্যেবেলায় নৌকোতে গিয়ে চড়লুম। যশোরের নিচে ভৈরব নদী দেখলুম যে দাম ও শেওলায় আগাগোড়া ছাওয়া, আর তারই গায়ে রয়েছে খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা বাড়ি; শুনলুম, এই হচ্ছে সে শহরের জেল। এই দামের ভিতর দিয়ে নৌকো কী করে এল তা বুঝতে পারলুম না।

আর মনে আছে সেই রাত্তিরের কথা, যেদিন আমরা যশোর ত্যাগ করি। নিত্য যা ঘটে তা ঘটনাই নয়। একটা অসাধারণ নড়াচড়ার কথা, ছোট ছেলেদের তা-ই মনে থাকে।

আমার বয়েস যখন পাঁচ বৎসর, তখন আমরা যশোর ছেড়ে কৃষ্ণনগর রওনা হই।

যশোরে ছ্যাকড়াগাড়িতে চড়ে সমস্ত রাত চলার পর বনগাঁয় পৌঁছই, আর সেখানে এক দিন এক রাত থেকে পরদিন সকালে আবার ছ্যাকড়াগাড়িতে চড়ে চাকদহ যাই। আর সেখানেই প্রথম রেলগাড়ি দেখি। সেই রেলগাড়িতে চড়ে বগুলায় আসি— আবার সেখান থেকে আমরা ছ্যাকড়াগাড়িতে চড়ে শেষটা কৃষ্ণনগরে আসি।

যশোরের এই চারটি ঘটনা শুধু আমার মনে আছে। প্রথমে অগ্নিকাণ্ড, তারপর পিরালীবাবুর জলকেলি, তারপর যশোর থেকে নৌকাযাত্রা, আর শেষটা যশোর-ত্যাগ। বাদবাকি সব অন্ধকার।

AMARBOI.COM

যশোরে আমরা অনেকে এক বাড়িতে থাকতুম। বাবা, মা, পাঁচ ভাই, দুই বোন আর দু-একটি আত্মীয়। এঁদের কারও কথা আমার মনে নেই, একমাত্র আমার অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ কুমুদনাথের কথা ছাড়া। এর কারণ বোধ হয় আমরা পিঠপিঠি দু-ভাই একসঙ্গে খেলা করতুম ও বেড়াতুম।

আমাদের বাড়িতে মুখুজ্যেমশায় নামে একটি লোক থাকতেন। তিনি কে, তা আমি জানিনে। তিনি বসে-বসে সেতার বাজাতেন। আমাদের পরিবার সঙ্গীত-ছুট। অর্থাৎ সঙ্গীতের চর্চা কেউ করতেন না। সুতরাং মুখুজ্যেমশায় সেতারের মাস্টার ছিলেন না। তাঁর সেতারের বোল পরে শুনেছি মা-র মুখে; সে কথা পরে বলব।

আর আমি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্তশিষ্ট আর তার ছিল কপালজোড়া দুটি চোখ, নাক খাঁদা নয়, আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বৎসর বয়সে যদি কেউ love-এ পড়ে, তা হলে আমি তার সঙ্গে love-এ পড়েছিলুম। অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনে হত মেয়েটির কী হল, কার সঙ্গে বিয়ে হল। এই মেয়েটিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য একটি ছোট গল্পও পরে লিখেছি।

এই আমার যশোরের স্মৃতি। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

AMARBOI.COM

কৃ ষ্ণ ন গ র

আজ লিখতে মন বসছে না। রবীন্দ্রনাথের কঠিন রোগের ভাবনায় আমার মন ভরে রয়েছে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই আর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল তাঁর ছায়াতেই মানুষ হয়েছি। পরশু রাত্তিরে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। আমি যখন তাঁর ঘরে যাই তখন তিনি তন্দ্রাভিভূত, খাটে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। কী অসাধারণ সুন্দর পুরুষ। এ অবস্থাতেও তাঁর দেবদুর্লভ রূপ আমাকে চমকে দেয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই রূপের ভক্ত। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখি, তখন তাঁর অসামান্য রূপই আমাকে মুগ্ধ করে। আর সেদিন যা দেখলুম, তাতে মনে হল তিনি আরও সুন্দর হয়েছেন; আমি কৃষ্ণনগরেই আমাদের বাড়িতে

প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি। সুতরাং কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে আমার বাল্যস্মৃতি আজ আর লেখা হবে না। আশা করি তিনি এ যাত্রায়ও আরোগ্য লাভ করবেন, কেননা তাঁর vitality-ও অসাধারণ। লোকোত্তর পুরুষের কথা বইয়ে ঢের পড়েছি, কিন্তু দেখেছি শুধু একটি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের দোসরা অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এ ফাঁড়া কাটিয়ে উঠবেন।

এখন বাল্যকালে ফিরে যাওয়া যাক।

কৃষ্ণনগরে এসে আমি হঠাৎ জেগে উঠলুম— অর্থাৎ আমি চেতন পদার্থ হলুম। বোধ হয় ঠিকে গাড়ির এক দিন এক রাত ঝাঁকুনিতে! যশোর থেকে বনগাঁ, বনগাঁ থেকে চাকদহ, বগুলা থেকে ন-মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে একটা পুঁটলির মতো ঠিকে গাড়ীতে আসতে হয়।

কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করা মাত্র ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সব আমার নাক, কান, চোখের ভিতর দিয়ে ভিড় করে ঢুকতে লাগল। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু হল। আমি নানা বস্তুর রূপ দেখলুম আর তাদের নামও শিখলুম। দার্শনিকেরা যাকে বলেন নামরূপের জগৎ, সেই জগতের সঙ্গে আদানপ্রদানের কারবার আরম্ভ হল। এ জগৎ যে বিচিত্র, সে জ্ঞান আমার জন্মাল। যাঁরা বলেন মন নামক কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মন হচ্ছে দেহেরই বিকার, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, ঠিক কোন্ সময়ে এ বিকার শুরু হয় তা কি তাঁরা বলতে পারেন? আর এ বিকারের উদ্দেশ্যই বা কী?

AMARBOI.COM

কৃষ্ণনগরে আমি শৈশবে ও বাল্যকালে কী শিখেছি, তা বলতে গেলে পাঁচ বৎসর থেকে পনেরো বছরের হিসেব দিতে হয়। যা শিখেছি তার বেশির ভাগ unconsciously শিখেছি, আর কিছু consciously. সুতরাং আমি consciously যা শিখেছি, তারই কথা প্রথমে উল্লেখ করব। এই শহরেই আমি ক খ শিখেছি, A B C-ও শিখেছি।

কৃষ্ণনগরে এসে প্রথমে মিশনরি স্কুলে ভর্তি হই। সে স্কুল বেশ বড় স্কুল ছিল, আর কেলাস হত সব বড়-বড় ঘরে। কেলাসে কী শেখানো হত, তা মনে নেই। বোধ হয় প্রতি হপ্তায় একজন পাদরি এসে আমাদের খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। মাসখানেক পরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কী শিখেছি। আমি ও সেজদা আদম ও ইভের নাম করতেই তিনি মহা চটে বললেন— ও-সব গাঁজাখুরি গল্প তোমাদের শিখতে হবে না! আর কিছু শিখেছ? আমরা বললুম— পাদরিসাহেবের কাছে একটি ভজন শিখেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন— কী ভজন?

আমরা দু-ভাই মিলে ভজনটি গাইলুম—

বন্যে এল ভেসে গেল, চাষার ডুবল ধান,
শালাদের যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি দিলেন ভগবান।

এ ভজন শুনে বাবা চোখ রাঙিয়ে বললেন— তোমাদের স্কুলে আর যেতে হবে না। আর মা-কে সম্বোধন করেও বললেন— কী কর্ম? মা বললেন, চাষাদের কুকর্ম এই যে, তারা খ্রিস্টান হয়নি।

এর পরই আমরা সে স্কুল ত্যাগ করলুম।

বাবা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেব-দ্বিজে তাঁর বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না। আমাদের চৌধুরী পরিবারের কেউই ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন না। যদিচ আমরা যাদব কীর্তনিয়ার বংশধর ও শ্যামরায় হচ্ছেন আমাদের কুলদেবতা, তবুও আমরা বৈষ্ণব নই। একে এই অভক্ত চৌধুরী পরিবারের ছেলে, তার উপর হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, তাই বাবা সকল ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বিশেষত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর কোনরূপ অনুরাগ ছিল না। বরং বিরাগ ছিল। এর কারণ বোধ হয় অল্পবয়সে জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। উক্ত ভদ্রলোক খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করায় বাবা খ্রিস্টধর্মকে ভয় করতেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে সদাই উন্মুখ ছিলেন। পারিবারিক সংস্কারে তিনি এ বিষয়ে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং আমরা যে আদম ও ইভের রূপকথা শুনব, তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। এই সকল কারণে আমরা ছেলেবেলায় কোন ধর্মশিক্ষা পাইনি।

গুরুজনদের আদেশে আমি ও আমার সেজদাদা মাসখানেকের মধ্যেই মিশনরি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। অতঃপর আমরা ব্রজবাবুর স্কুলে ভর্তি হলুম। সে স্কুল এখন A V School নামে পরিচিত।

এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রজ মুখুজ্যে নামক নেদের পাড়ার জনৈক ভদ্রলোক। নেদের পাড়ার ভালো নাম হয়তো নদীয়ার পাড়া।

এ স্কুলে খ্রিস্টান কিংবা অপর কোন ধর্মের নামগন্ধ ছিল না। ব্রজবাবু ছিলেন ঘোর নাস্তিক। তাঁর স্কুলে ঈশ্বরের প্রবেশ নিষেধ ছিল, উপরন্তু তিনি ছিলেন ঘোর তার্কিক।

তাঁকে কেউ তর্কে এঁটে উঠতে পারতেন না; ফলে তাঁর সঙ্গে কেউ সদালাপ করতেও ভয় পেতেন। রাস্তায় তর্কের ভয়ে লোকে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলত। আমি দূর থেকে তাঁকে দেখেছি— শরীর তাঁর ছিল কৃশ

এবং আকার তাঁর ছিল দীর্ঘ। আর তাঁর চরিত্রও ছিল লাঠির মতো কঠিন।

এ স্কুলে ঢুকে আমরা খুশি হইনি।

মিশনরি স্কুল ছিল প্রকাণ্ড হাতার ভিতর প্রকাণ্ড বাড়ি— পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

ব্রজবাবুর স্কুলে ছোট ছেলেদের ক্লাস হত একটা অন্ধকূপে। একটি এঁদো ঘরে আমরা পড়তে যেতুম। সে ঘরে আলো আসত না, বাতাসও না। তার উপর ঘরটি ছিল এত ছোট যে, ছাত্রদের সে ঘরে ব্ল্যাক হোল-এর মতো ঠাসা হত। সে স্কুলে কী পড়ানো হত আমার মনে নেই; বোধ হয় কিছুই হত না। শুধু শনিবারে একটি প্রকাণ্ড পুরনো ছবির বই থেকে বাঘ-ভালুক প্রভৃতির ছবি দেখানো হত।

সিংহ আমরা ইতিপূর্বে দেখেছিলুম— ছবিতে নয়, মাটির সিংহ, প্রতিমার পায়ের নিচে। ভালুকের নৃত্যও দেখেছিলুম— দেখিনি শুধু বিদেশি জানোয়ার। জিরাফের কথা আজও মনে আছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন— কী পড়ছ?

আমরা বললুম— জানোয়ারের ছবি দেখছি।

বাবা বললেন, আমি স্কুল ভেবে তোমাদের দেখছি চিড়িয়াখানায় পাঠিয়েছি।

তার পরদিনই তিনি আমাদের সে চিড়িয়াখানা হতে বার করলেন।

সেজদাদাকে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হলে আমার শিক্ষা একটা সমস্যা হয়ে পড়ল। আমাকে তখন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। কিন্তু সেখানে বেশি দিন থাকা হল না। ইতিমধ্যে যে-সব বালকের সঙ্গে খেলার মাঠে পরিচিত হয়েছিলুম, তারা বিদ্রূপ করে বলতে লাগল— যাদের দশ হাত কাপড়েও কাছা নেই, তাদের সঙ্গে পড়া লজ্জার কথা। আমি বাবাকে বললুম—যাদের দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়ব না।

বাবা কথাটা শুনে প্রথমে হাসলেন, পরে বললেন— তোমার কথা ঠিক।

দ্বিতীয় বার co-education ঐখানেই শেষ হল।

তারপর আমার বিদ্যারম্ভ হল। মা বললেন— অবু তবু গিরিসুতো, আর পুরুত কী বললে মনে নেই। তারপর বংশী মুচির জুতোর দোকানের পাঠ-শালায় তালপাতায় খাগড়ার কলম দিয়ে ভুসো কালিতে বড়-বড়

অক্ষরে ক খ লিখতে শিখি। কিন্তু বংশী মুচির পাঠশালায় বেশি দিন টিকতে পারিনি। কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধে সেখান থেকে পালাতে হল। আমাদের বাসার কাছে Charity School নামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল, তারপর সেই স্কুলে ভর্তি হলুম। এ স্কুলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি খুলে গেল এবং সত্য কথা বলতে যথার্থ লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলুম। এ স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন একজন 'কুরি'— যাকে আমরা বলি ময়রা। লোকটি ছিলেন প্রকাণ্ড পুরুষ, অতি ভদ্র, অতি সহৃদয় ও রাশভারি লোক। ছেলেদের তিনি মারধর করতেন না, তা হলেও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম। এ স্কুলে আমি প্রায় তিন বৎসর পড়ি। আর সেখানেই আমি সমগ্র পাটিগণিত, বাংলার ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত— অবশ্য আংশিক ভাবে— শিখি। আর শিখি শিকলের জরিপ আর কালি করতে। শেষটা বড়দাদা আমাকে সে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। আমাদের বাড়িতে জনৈক ভদ্রমহিলা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, মেমের সাজপোশাক-পরা ও কষে কর্সেট-আঁটা। তিনি চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে, কৃশাঙ্গীটি কে? দাদা বললেন যে, ছোকরা যথেষ্ট বাংলা শিখেছে, আর বেশি শিখতে হবে না। পরের দিনই ছাত্রবৃত্তি স্কুল থেকে আমার নাম কাটানো হল। তারপর কোন্ স্কুলে যাব তা স্থির করতে-করতে কিছু দিন গেল। সেকালে কৃষ্ণনগরে দেবনাথ মাস্টার নামে একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি যে কোন্ স্কুলের মাস্টার ছিলেন, তা কারও জানা ছিল না। ছিরু মাস্টার বলে একজন ছিলেন, তিনি খালি-পায়ে খালি-গায়ে শীত-গ্রীষ্ম একখানি র‍্যাপার পিঠে ফেলে ভিক্ষে করে বেড়াতেন। তিনি কারও বাড়ি এসে প্রথমেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রামতনুবাবুর কেচ্ছা কাটতেন, তারপর সিকেটা-আধুলিটা চাইতেন, এবং তা পেতেন। সুখের বিষয়, তাঁর কোন স্কুল ছিল না।

দেবনাথ মাস্টার বেশভূষায়, চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত লোক ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা মাস্টারমশায় সেজে বেড়াতেন। পায়ে একজোড়া তালি-মারা জুতো, পরনে পেন্টলুন, গায়ে একটি ছাতার কাপড়ের চাপকান— বয়েসে যার রং হয়েছে হলদে— ও মাথায় একটি টুপি। তিনি বলতেন যে, তাঁর তুল্য শিক্ষক আর নেই। তিনি একটি নতুন স্কুল খুলবেন এবং সেই স্কুলে আমাকে ভর্তি করতে হবে বলে বাবাকে ধরপাকড় করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাতে রাজি হলুম না। না-হবার কারণ, স্কুলবাড়িটি

ছিল জঘন্য। সেদিন শুনলুম দেবনাথ মাস্টারের স্কুল আজও টিকে আছে এবং হাইস্কুল হয়েছে। এ পরিণতি যে কী করে হল, বুঝতে পারিনে। দেবনাথ মাস্টার হয়তো পয়লা নম্বরের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে কোন কালে কিছু শিক্ষা করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পাইনি। সংস্কৃতে আছে যে, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করে। যদিচ চেহারায় মাস্টার-মশায় সিংহ ছিলেন না, ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচর্মসার একটি ব্যক্তি।

সে যা-ই হোক, আমি কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই এবং তেরো বৎসর পর্যন্ত পড়ি। এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাব, এমন সময়ে ঘোর ব্যারামে পড়ি; আর কিছু দিন বাবার কাছে আরায় থেকে পরে কলিকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হই। সেই বয়েস থেকেই আমি কলিকাতাবাসী হই। কৃষ্ণনগরে কলেজিয়েট স্কুলের বিষয়ে বেশি কিছু বক্তব্য নেই। নিচু ক্লাসের মাস্টারেরা ছিলেন কুমোর ও গাঁড়াল। এই জাতীয় শিক্ষকদের চেহারা আজও মনে আছে। পঞ্চানন পাল ছিলেন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ— আর তাঁর মুখটি ছিল বাটালি দিয়ে নয়, কুড়ুল দিয়ে কাটা; এমন বিশাল চোখ আজ পর্যন্ত আর কোন মানুষের মুখে দেখিনি। আর নাকটি ছিল তদ্রূপ।

লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছ-মাংস কখনও খেয়ো না, যেমন আমি খাইনে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো, যেমন আমি খাই; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুকরো মাছ কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপসে আতা উসকো আনে দেও— এই বলে! বাবা এই উপদেশের কথা শুনে আমায় ফারসি পড়তে আদেশ করলেন। আমি আলেফ, বে পড়তে আরম্ভ করলুম। মৌলবি সাহেব ছিলেন অতি সুপুরুষ আর তাঁর বেশভূষা ছিল সুন্দর— উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি ভদ্র। কেন ফারসি পড়া ছেড়ে দিলুম, তা পরে বলব।

সে স্কুলের মাস্টারমশায়রা কেউ-কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, সিক্সথ ক্লাসের মাস্টার অটল মৈত্র ও থার্ড ক্লাসের মাস্টার পূর্ণ মিত্র। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে যা শিখেছিলুম, কলেজিয়েট স্কুলে তার বেশি কিছু শিখিনি। পাটিগণিত, ভূগোল, বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস শিখে এসেছিলুম। তাতেই এনট্রান্স পর্যন্ত কুলিয়ে গিয়েছিল। নতুনের মধ্যে শুধু শিখেছিলুম ইংরেজি, সংস্কৃত, জ্যামিতি ও বীজগণিত। ইংরেজি অবশ্য স্কুলে

শিখিনি, শিখেছিলুম আমার সেজদার কাছে। তিনি আমাকে বুঝি আর না-বুঝি স্কটের উপন্যাসগুলি পড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বই পড়তে-পড়তে আমি ইংরেজি শিখি; আর আমাদের সহপাঠীদের তুলনায় ভালোই শিখি। আর সংস্কৃত শিখি পরীক্ষা পাশ করবার মতো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখি। স্কুলে যে-পণ্ডিতমশায় ছিলেন, তিনি যেমন ভালোমানুষ, তেমনি নির্বোধ। তাঁর কাছে কিছু শিখিনি, কেননা তিনি কিছুই শেখাতে পারতেন না। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণ কোন পণ্ডিতকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্তর্কালঙ্কার মশায়, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করেন, স্তিলের স্তৈল মেখে স্ত্রিবেণীর ঘাটে স্তান করতে যাচ্ছি! আমাদের পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল তদ্রূপ।

আমি স্কুলে কী শিখেছি, সেই কথাই বলছিলুম। সোজা কথা এই যে, বিশেষ কিছু শিখিনি। সেকালে শিক্ষার পদ্ধতি তেমন বাঁধাধরা ছিল না। এবং নিচু ক্লাসের মাস্টারমশায়রাও তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। তবে তাঁরা আমাদের গায়ে হাত দিতেন না। এককথায়, সেকালে শিক্ষার অত্যাচার ছিল না।

স্কুলে আমরা ক, খ শিখি আর অনেক জিনিস শিখি unconsciously.

কৃষ্ণনগর ছিল পাড়াগেঁয়ে শহর— অর্থাৎ অর্ধেক শহর, অর্ধেক পাড়াগাঁ। সেখানে অনেক কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাকরা, কলু প্রভৃতি বাস করত, আর তাদের দোকানে আমাদের গতিবিধি ছিল অবাধ। এমন-কী, গুলির আড্ডায়ও দু-একবার গিয়েছি। শুঁড়ির দোকানেও। গুলি খেত ছোটলোকেরা, আর মদ খেত আধা-ভদ্রলোকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বাঙাল; জমিদারির আমলা যারা, মোকদ্দমার তদ্বির করতে কৃষ্ণনগরে আসত। কিন্তু শুঁড়িরা মদ খেত না— অন্তত দোকানে নয়।

আমাদের ছেলেবয়সে ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল, সুতরাং কাকে লাট খাওয়া বলে, কাকে কান্নি মারা বলে, কাকে গোত্তা মারা বলে, তা-ও আমরা শিখেছিলুম এবং তাসের সুতোর গুণ কী, রিলের সুতোর বা ফেটির সুতোরই বা গুণ কী, তা-ও আমরা শিখেছিলুম। ফেটির সুতো হচ্ছে দেশি সুতো। চাষারা ও-সুতো উরতের উপর পাক দিত। খরমাঞ্জা হলে নাকি ফেটির সুতোরই উপর ভালো। ঘুড়ি অবশ্য নিম্নশ্রেণীর লোকরাও ওড়াত। এই সূত্রে সব জাতের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজের উত্তরে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া ছিল। সেখানে বাস করত যারা মাছ ধরে, নৌকো বায়। তারা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আর তাদের কাছেই শিখেছি, নৌকোর কোন্ অংশকে গলুই বলে, কাকে পাটাতন বলে, আর কাকে হাল বলে, পাল বলে, কাকে লগি মারা বলে, কাকে গুণ টানা বলে। আর তা ছাড়া নৌকোয় কাঠ জুড়তে হয় গাবের আঠা দিয়ে। এদের নৌকোয় আমি একবার কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী গিয়েছি, দু-বার হুগলী পর্যন্ত। ঝড়ঝাপটা উঠলে আমাদের নৌকো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হত, আর মাঝি নোঙর ফেলত।

এর থেকে সহজেই বুঝা যাবে যে, বাংলা ভাষা আমি একমাত্র বই পড়ে শিখিনি। শিখেছি নানা শ্রেণীর নানা লোকের মুখে শুনে; যেমন সকলেই শেখেন। কিন্তু এ সব কথা আজ পর্যন্ত আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বোধোদয়েও নয়, কথামালাতেও নয়, সীতার বনবাসে তো নয়-ই। আমি ও-জাতীয় শব্দ আবশ্যক হলে আমার লেখায় ব্যবহার করি। ফলে আমার সাহিত্যিক ভাষারও পুঁজি বেড়ে গিয়েছে। আমি কৈশোরে ফরাসি ভাষাও কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করি, কিন্তু আজ পর্যন্ত ও-ভাষার বই সহজে পড়তে পারিনে, কারিগরদের নিত্যব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত নই বলে। এ ছাড়া বহু গাছপালা ও সাপের নাম শিখি। সে সব নাম চলতি ভাষাতেই পাওয়া যায়। অবশ্য এ সব কথার প্রদেশ-বিশেষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কারিগরদের যন্ত্রপাতির নাম শুধু কানে শুনে শেখা যায় না, তাদের চোখে দেখেও শিখতে হয়; গাছপালারও তা-ই, পাখি ও জানোয়ারদেরও তা-ই। নামের সঙ্গে রূপের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এ সব কথা আয়ত্ত করতে হয় না। তা ছাড়া, সেকালে নদে-শান্তিপুরের মৌখিক কথাও খুব শ্রুতিমধুর ছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল সেই ভাষাই— কী উচ্চারণে, কী অর্থব্যক্তিতে— বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে ভাষার তুলনায়— কী পূর্ববঙ্গের, কী কলকাতার ভাষা ঈষৎ শ্রুতিকটু লাগত। তাই আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা। ইতিমধ্যে আমার মুখের কথা যদি কিছু বদলে গিয়ে থাকে তো সে কলকাতার মৌখিক ভাষার প্রভাবে নয়। আমি এখন সাহিত্যিক বলে গণ্য। তাই আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার কথা বলছি। আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাংলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিনকালেও আদর্শ ছিল না।

অবশ্য কে কোথা থেকে ভাষা সংগ্রহ করেছেন বলা শক্ত, কিন্তু মোটা-মুটি ভাবে বলা যায়, তা-ই বলতে চেষ্টা করলুম। ভাষা ব্যবহার করতে selection-এর প্রয়োজন— আর এই selection হয় লেখকের স্বীয় রুচি অনুসারে।

আমি সেকালের কৃষ্ণনগরের কথা বড় বেশি করে বলছি। তার কারণ এই যে, আমাদের বিশ্বাস ছিল তার তুল্য ভাষা বাংলায় আর কোথাও নেই।

যার গলায় সুর আছে সে গান করতে বসলে তার সুর যেমন আপনা হতেই বাঁকেচোরে আর ঘোরে; তেমনি যার মুখের ভাষা ভালো, সে-ও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে-ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখারও ভাষা। ফরাসিরা যাকে jeu de mots বলে, সে খেলার চর্চা সে শহরেও করা হত। এর ফলে আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে তো তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দু-জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দু-জনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু-জনেরই লেখায় আর যে-গুণের অভাব থাক— রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুধু লোককে হাসাবার জন্য লেখা হয়নি। এর মধ্যে অনেকগুলি গান মারাত্মক বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ানো হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিজম, ঝুটো ধর্ম ও নানা প্রকার সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

এর কারণ, আমার ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাগরিকরা পঞ্জিকাশাসিত ছিলেন না, যেমন আজও অনেক শিক্ষিত লোক আছেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। যদিচ কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের পাশের নগর, তবুও সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের কোন ভক্তকে আমি দেখিনি। কৃষ্ণনাগরিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন না, দু-একজন ছাড়া। সুতরাং কোন ধর্মের গোঁড়ামি আমাদের কান-মন স্পর্শ করেনি। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত থেকে আমরা মুক্ত ছিলুম। এর ফলে মানসিক খোলা

হাওয়ায় আমরা বাস করতুম। সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বাভাবিক ছিল। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চা করত।

ভাষা আমরা একমাত্র লোকের মুখে শিখিনে, বই পড়েই শিখি। কৃষ্ণ-নগরে বাসকালে আমি কী-কী বই পড়েছিলুম, তা বলছি। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কাশীদাসের মহাভারতের কতক অংশ, আর হয়তো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস পড়ি। কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙ্গলার ইতিহাস ও তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাস— এই দুখানি বই আমায় স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান দেয়। সেকালে আমার মনে হত, বই দুখানি ভালো ও সুখপাঠ্য। আমাদের বাড়িতে বাংলা বইও খানকতক ছিল। বঙ্গদর্শন বাঁধানো ছিল। আর সেই বাঁধানো বঙ্গদর্শন থেকে আমি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ, আর বোধ হয় কপালকুণ্ডলা পড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য আর নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধও পড়ি। নীলদর্পণ আমি পড়িনি, কিন্তু তার অভিনয় দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান আমাদের খুব প্রিয় কাব্য ছিল। আর এ ছাড়া শিশির ঘোষের নওশ' রুপেয়া।

বাবা বাংলা বই পড়তেন না, কেননা তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি দেদার বই পড়তেন, কিন্তু সে সবই ইংরেজি বই। তবে এ সব বই এল কোত্থেকে?— বাবা যখন যশোরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন দীনবন্ধু মিত্র সে শহরে পোস্ট আফিসে কোন বড় চাকরি করতেন, নবীন সেনও ছোকরা ডেপুটি ছিলেন, আর আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমের ভাই সঞ্জীবও ছিলেন ডেপুটি; আর শিশির ঘোষ তো যশোরের লোক।

সে যা-ই হোক— অল্পবয়সেই আমি কালী সিংহের মহাভারত পড়েছি, আর পড়েছি হরিদাসের গুপ্তকথা। এ বই অবশ্য বালকের পাঠ্য নয়, কিন্তু তার ভাষা সাধুভাষা নয়, আর অতিশয় চটকদার। সে বইয়ের প্রথম পাতা পড়ে দেখবেন— লেখা কী চমৎকার। অবশ্য আরব্য উপন্যাস বাংলায় পড়েছি আর পারস্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশো ও রাসেলাস্। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর একটি কবিতা 'ভারত সঙ্গীত' আমাদের সেকালে মুখস্থ ছিল। সেকালে বাঙালির মনে পেট্রিয়টিজমের জোয়ার এসেছিল— আর আমরা ছোট ছেলেরা সে জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলুম।

আমাদের বাড়িতে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা ছিল। বাবার পড়ার ঝোঁক বোধ হয় উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করি।

আমার বড়দাদা ইংরেজি ভাষা খুব ভালো জানতেন; আর আমার সেজদাদা কুমুদনাথ অল্প বয়েস থেকেই ছিলেন শিকারি। তিনি শিকারের বই পেলেই পড়তেন। শেষ বয়সে তিনি শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তিনিই আমাকে ইংরেজি নভেল পড়তে শেখান, এ কথা পূর্বে বলেছি।

আমাদের ইংরেজি সাহিত্যচর্চার সুযোগ ছিল। বাবার একটি ইংরেজি বইয়ের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল। মা-র মুখে শুনেছি, বাবা হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে ফেরবার সময়ে এক দিনে এই লাইব্রেরি কেনেন। এ লাইব্রেরিতে ছিল অনেক ইতিহাসের বই ও প্রতি ঐতিহাসিকের সমগ্র বই। কারও বই সাত-আট ভল্যুমের কম নয়। আর ছিল স্কটের সমস্ত বই। দশ-বারো ভল্যুম শেক্সপিয়রের, মিলটনের সমস্ত কাব্য, বায়রনেরও তাই। বলা বাহুল্য এ সব বই আমরা স্পর্শও করিনি। মধ্যে-মধ্যে স্কটের দু-একটি নভেল পড়েছি। এই লাইব্রেরির প্রসাদে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি বহু ইংরেজি বইয়ের নাম জানতাম। এর ফলে দাদার, সেজদার, আমার ও আমার ছোট ভাই অমিয়র বই-কেনা বাতিক হয়।

পরে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি লাইব্রেরি সংগ্রহ করি। সব চাইতে বড় লাইব্রেরি ছিল দাদার, তারপর সেজদার ও অমিয়র। বাবার লাইব্রেরি ও দাদার লাইব্রেরি এখন কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমার ফরাসি লাইব্রেরিও সেখানে, এবং আমার ইংরেজি বই শান্তিনিকেতনে। আর শ-পাঁচেক বই আমার কাছে আছে।

বই কিনলেই যে পণ্ডিত হয়, তা অবশ্য নয়। তবুও এ সব কথা বলছি এই জন্য যে, লাইব্রেরি করার শখ এখন আর লোকের নেই। তার একটি কারণ, লাইব্রেরি থাকলে পুরনো কাগজের দামে বিক্রি হয়।

কলকাতা শহরে দেখেছি কোন-কোন বাড়িতে বড় লাইব্রেরি ছিল; এখন নেই।

আমি জানি সুবোধ মল্লিকের কাকা হেমন্ত মল্লিকের বাড়িতে একটি নাতি-হ্রস্ব লাইব্রেরি ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেদার বই কিনতেন, কিন্তু লাইব্রেরি গড়েননি। গগনেন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের একটি চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। তাঁর সংগৃহীত ফরাসি বই আমি কিনি। কিন্তু তাঁর ইংরেজি বইয়ের কী হল জানিনে। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল।

এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা কৈশোরে লাইব্রেরির

আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। এখন লাইব্রেরি হয়েছে সকলের জন্য— ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়।

আমি ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ ইংরেজিও শিখেছিলুম। মাস্টারমশায়ের পড়ানোর গুণে নয়— নিজে পড়েই। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়া ছেলে— ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ আমার মোটেই ভালো ছিল না। বার্ড, ওয়ার্ড প্রভৃতি শব্দ আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারতুম না, আর দাদরা আমার এই অক্ষমতার দরুন আমাকে ঠাট্টা করতেন। আমার বয়েস যখন নয়, তখন সেজদাদা আমার ইংরেজি শিক্ষার ভার নিলেন। আমাদের অবশ্য জনৈক গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন আমাকে a, b, c, d শেখান, তখন তিনি ফার্স্ট কেলাসে পড়তেন, আর আমি যখন এনট্রান্স কেলাসে উঠি, তখনও তিনি সেই কেলাসেই পড়তেন। তিনি এনট্রান্স কেলাসে শিকড় গেড়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার অক্ষমতাই তাঁর লাগাড় ফেলের কারণ। তাঁর কাছে একটি অমূল্য উপদেশ পেয়েছি। তিনি উঠতে-বসতে বলতেন, 'হরি হে ত্রাণ করো, যার ধারি তার মরণ করো।' তাঁর গুরুভক্তির আর-একটি প্রমাণ— তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন— 'গুরু! টেনে ধরো চোখের ভুরু।' ইনি ঢুকেছিলেন আমাদের গৃহশিক্ষক হয়ে, শেষটা হয়েছিলেন আমাদের বাজার-সরকার।

আমাদের ছেলেবেলায় আর্ট কথাটা বাংলা ভাষায় ঢোকেনি। ইংরেজিতে যাকে আর্টিস্ট বলি, আমরা তাদের কারিগর বলেই জানতাম। আমার বিশ্বাস, এই কারিগরদের দল থেকেই আর্টিস্ট উদ্ভূত হয়েছে। যেমন ইতালি দেশে হয়েছিল। আমরা সে দেশের যে-সকল লোককে বড় আর্টিস্ট বলে মানি, তারা প্রথমে ছিল কারিগর মাত্র।

সে যা-ই হোক, কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিল যথার্থ আর্টিস্ট। তাদের মতো প্রতিমা গড়তে অন্য প্রদেশের কুমোরেরা পারত না। সুন্দর প্রতিমা গড়া তো বড় শিল্পীর কাজ। কিন্তু কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা কেউ শিব গড়তে বাঁদর গড়ত না। আমি তাদের হাতের চমৎকার আহ্লাদি পুতুল দেখেছি, যার দাম দু-পয়সা। ওর ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে, যা দেখে হাসি পায়। মুখব্যাদান করে এ পুতুল লোককে হাসায় না। হাসায় তার গড়নের গুণে। আজকাল শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবিগুলি প্রায়ই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্যরস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুলনির্মাতাদের ছিল। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের মতো বাংলায় অপর কেউই ক্লে-মডেলিংয়ে ওস্তাদ ছিল না।

আমার ছেলেবেলায় যদু পাল নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।

দাদা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন— এবং দাদার অনুরোধে তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি দেখে ভিনাস গড়তেন। আমাদের বাড়িতে তাঁর রচিত ছোট-ছোট দুটি-তিনটি ভিনাস ছিল; আমার সেকালে মনে হত যে তারা বিলেতি ভিনাসের অনুরূপ। তার একটিও আজ নেই, কারণ পাথরে নয়, মাটিতে তাদের গড়া হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের মাটি এঁটেল হলেও পাথরের মতো বহুকাল স্থায়ী নয়। সে মাটি গুণীর হাতে পড়লে নানা বস্তুর রূপ নেয়, কিন্তু সে সব বস্তুর ধর্ম নিতে পারে না। এই যদু পালের বংশধরেরা এখনও গুণী বলে পরিচিত।

মাটির মূর্তি প্রথমে গড়ে পরে সেটিকে পাথরে নকল করার নাম ভাস্কর্য।

কৃষ্ণনগরে স্থাপত্যেরও সাক্ষাৎ পাই— আর্কিটেকচার। রাজবাড়ির চকফটক অতি সুন্দর আর রাজবাড়ির পুজোর দালান ও নাটমন্দির চমৎকার। এ কটিই মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর লক্ষণ। এর তুল্য পুজোর দালান ও নাটমন্দির আমি অন্য কোথাও দেখিনি। নদীয়া জেলায় ইংরেজ আমলে গড়া দু-একটি প্রকাণ্ড ইমারত দেখেছি, কিন্তু তাতে চোখ-ভোলানো সৌন্দর্য নেই।

কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির এ সব ইমারত কারা গড়েছে জানিনে, তবে এ যে মুসলমান স্থাপত্যের নমুনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিচে মোটা ও উপরে সরু থামের উপরে টানা খিলেন যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুদৃশ্য। আমাদের হরিপুরের বাড়ির মণ্ডপের সুমুখে বারান্দায় এই রকম থাম ও খিলান ছিল; এখন নেই, দাদারা তা ভেঙে ফেলেছেন, বোধ হয় খিলেন-গুলো ভেঙে পড়বে ভয়ে। কোথায় কৃষ্ণনগর আর কোথায় হরিপুর। এই দুই জায়গায়ই যে একই নমুনার থাম ও খিলেন ছিল তার থেকে অনুমান করছি দুই-ই মুসলমান স্থাপত্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, কলেজিয়েট স্কুলে একটি গাঁড়াল মাস্টার ছিলেন। শুনেছি যে-কেউ সেকালে ইমারত গড়ত, তারাই গাঁড়াল বলে পরিচিত। এর থেকে অনুমান করছি যে, সেকালে ভাস্কর্য-স্থাপত্যের চর্চা হিন্দুরাই করত। ইংরেজ আমলে সব উলটে-পালটে গিয়েছে। আর্ট জিনিসটা এখন আমাদের ওষ্ঠাগত— করায়ত্ত নয়।

ছবি আঁকিয়ে লোক আমি সে শহরে দেখিনি। দুটি-একটি পোটো অবশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু কোন হিসাবেই তাদের চিত্রকর বলা যায় না।

তারা দেয়াল রং করতে পারত ও লতাপাতা আঁকতে পারত। বোধ হয় সেকালে ছবির কোন চাহিদা ছিল না।

কিন্তু ফণী সেন বলে কৃষ্ণনগরে একটি যুবক ছিলেন। তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র। তিনি এবং আরও তিন-চার জন আর্ট স্কুলের ছোকরা মিলে সরস্বতী, চৈতন্য প্রভৃতির ছবি এঁকে আর ছাপিয়ে বাংলা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম ছাপানো ছবি আমি বহু লোকের ঘরে দেখেছি। এঁদের পন্থা অনুসরণ করেই রবি বর্মা তাঁর সব ছবি আঁকেন এবং কতকটা প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

চিত্রকর সব আজকাল প্রাদুর্ভূত হয়েছেন এবং তাঁদের নব-নব উন্মেষশালী বিচিত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার শক্তি তাঁদের করায়ত্ত নয়।

যদিচ আমরা যাদবানন্দ কীর্তনিয়ার বংশধর, আমাদের গ্রামের নাম হরিপুর, আর আমাদের কুলদেবতা শ্যামরায়, তথাপি আমাদের পরিবার বৈষ্ণবও নয়, কীর্তনবিলাসীও নয়। শুধু কীর্তন কেন, কোনরূপ সঙ্গীতের চর্চা চৌধুরীকুলে কস্মিনকালেও ছিল না।

বাবা ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমি পূর্বে বলেছি যে, যশোরে মুখুজ্যেমহাশয় নামক জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে থাকতেন ও সেতার বাজাতেন। তিনি কারও সেতারের মাস্টার ছিলেন না। উক্ত ভদ্রলোকের চেহারা আমার আজও মনে আছে। তাঁর দাড়ি ছিল পাকা ও লম্বা, আর তাঁর দেহ ছিল কৃশ— না-লম্বা, না-বেঁটে।

আমি কৃষ্ণনগরে এসে মায়ের কাছে মুখুজ্যেমহাশয়ের দু-চারটি সেতারের বোল শুনেছি। আমার মাতুল পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল, তাই আমার মায়ের গানের গলাও ছিল— কানও ছিল। তাঁর কাছ থেকেই আমি সঙ্গীতপ্রিয়তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। আমি যে মধ্যে-মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাচালতা করি, তার কারণও সঙ্গীতের প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ।

ছেলেবেলায় আমার এই সেতারের বোল এত ভালো লাগত যে, আজও তা মনে আছে। একটি হচ্ছে এই :

শান্তিপুরের খালের ভিতর জাহাজ ডুবছে
    বজরা ভেসে উঠেছে,
সাহেব বলে, তোবা তোবা,
    বিবি বলে জান গেল!

আর একটা পাখি বলে
চোখ গেল।

দ্বিতীয়টির প্রথম ছত্র মনে আছে :

বৌ কথা কও পাখি ছিল ডালেতে বসে
তাদের মারলি কী দোষে!

সেতারের বোল শুধু দাদেরে দেরে নয়— গানও হয়।

আমি পরে একটি বেহাগের হিন্দি গান শুনি, সেটি অবিকল সেতারের গৎ থেকে গানে রূপান্তর করা হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের পরিবারে কেউ গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন না। অল্পস্বল্প যা গান গাইতে পারতেন আমার মা। তিনি অন্যের মুখে শুনে দু-চারটি গান শিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মৃদু অথচ মোলায়েম। তাঁর একটি গানের কথা আজও মনে আছে :

অয়ি সুখময়ী উষে
কে তোমারে নিরমিল (ললিত)

আর সেকালে ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম যুগে প্রকাশিত দু-চারটি গান শুনেছি, কার মুখে তা মনে নেই, তার কতকগুলি যেন আজও মনে আছে।

১। গাও হে তাঁহার নাম। (খাম্বাজ)

২। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে। (বাহার)

৩। দিবা অবসান হল। (পূরবী)

এই শেষ গানটি শুনে আমার মন মুষড়ে গিয়েছিল— শুধু ওর ভাষার জন্য নয়, সুরের জন্যও। পূরবী শুনলে আজও আমার মন দমে যায়। তার পর একটি যুবকের মুখে পিলু-রাগিণীর একটি গান শুনে আমার কানে অতি চমৎকার লাগল। তারপর পিলুর অনেক গান আরও দু-চার জনের মুখে শুনি।

তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের মুখে অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন অতি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাংলা, হিন্দি দু-ভাষারই গান গাইতেন, কিন্তু কী যে গাইতেন আমার মনে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা করেছিলেন। আরও দু-চারজনের মুখে অতি মিষ্টি গান শুনেছি, তাঁদের নামও মনে আছে।

এ সব গানই গাওয়া হত ওস্তাদি ঢঙে, ওস্তাদদের তাল-কর্তব বাদ দিয়ে। সেকালের বাংলা গানকে হিন্দি গানের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে। একেবারে তান বাদ দিয়ে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ গাওয়া যায় না, তাই ও-জাতীয় গান গাইতে হলে গলাকে একটু খেলাতে হয়, যা বেহাগ-বাগেশ্রীতে করতে হয় না। ফলে বাল্যকালে আমার কান তৈরি হয়েছিল বাংলায় যাকে বলে ওস্তাদি ঢঙের গানে। আজ পর্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায়নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের গা-ঘেঁষা শহর হলেও, এ শহরে কীর্তনের রেওয়াজ ছিল না। বোষ্টম-বৈরাগী সর্বত্রই আছে, কৃষ্ণনগরেও ছিল। এই ভিক্ষাজীবী বৈরাগীদের মুখে দু-চারটি কীর্তন শুনেছি। তার দু-একটি গানের সুর আজও মনে আছে। যথা : 'নদীয়ার বৈরাগীর রাজা শ্রীচৈতন্য গৌরহরি', আর 'হরিনাম বিনে কি বল আছে সংসারে, বল রে মাধাই মধুর স্বরে' ইত্যাদি-ইত্যাদি। একটা নেড়ানেড়ির গজল পুরো মনে আছে, সেটা হচ্ছে এই :

যদি গৌর চাস
    কাঁথা নে ধনী।
সকালবেলা ভিক্ষেয় যাবি
ঘরে এসে তেল মাখাবি,
আর পেতে দিবি বিছানাখানি।
আর গাঁজার কলকেয় আগুন দিবি দিবসরজনী।

এ গান শুনে আমাদের খুব মজা লাগত, কিন্তু ভক্তি বেড়ে যেত না। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় কীর্তন আমাদের মনে কোন ছাপ রেখে যায়নি, আর কীর্তন শেখবার লোভ আমাদের জন্মায়নি। আর নেড়ির এই গান : 'এ পুজোতে ঝুমকো দিবি তবে ঘরে রইব' ইত্যাদি উপরিউক্ত নেড়ার গানের সনাতন উত্তর। পুরুষ চায় সেবাদাসী, স্ত্রী চায় অলঙ্কার।

গান গাইবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, কিন্তু শক্তি সকলের নেই। আমার দাদাও গান গাইতে চেষ্টা করতেন। তাঁর একটি গানের প্রথম ছত্র আজও মনে আছে : 'ও-পাড়াতে দুধ জোগাতে যাই গো আমার বেলা হল।' এরই নাম কি মার্গসঙ্গীত? আমাকে জনৈক মারহাট্টি ওস্তাদ বলেছিলেন যে, 'বাত তো আচ্ছা লাগতি, গানেকা কেয়া জরুরত হ্যায়?'

দাদার গান সম্বন্ধে ঐ একই প্রশ্ন করা যায়। আমার মেজদাদা কখনও এইরূপ বৃথা চেষ্টা করেননি। আমার সেজদাদা কুমুদনাথ ছবি

আঁকতেন ভালো, আর বাঁশি বাজাতেন মন্দ নয়। কিন্তু শিকারে মত্ত হয়ে বাঁশি ও পেনসিল দুই-ই ত্যাগ করেন।

আমি অল্প বয়েস থেকেই গান গাইতুম। আমার কণ্ঠস্বর ছিল musical. এই কারণে, কানে যে-সুর আসত, গলায় তা বদলি হত। আমার গানের শিক্ষক ছিল বঙ্কু নামক স্কুলের ছেলে। তার গলা ছিল চমৎকার, যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি দরাজ। আর শিখি আমাদের গৃহ-শিক্ষকের কাছে। মাস্টারমশায়ের কণ্ঠে সুর ছিল কিন্তু স্বর ছিল না।

সেকালে কৃষ্ণনগরে খেলাধুলোও ছিল। ভাইদের মধ্যে আমি ছিলুম দুর্বল ও কৃশ, অথচ সুস্থ। অতএব খেলায় আমার কোনরূপ কৃতিত্ব ছিল না। বিদেশি খেলার মধ্যে ক্রিকেটই সকলে খেলত, আর তার নাম ছিল ব্যাটবল। সে ব্যাটবল খেলা ছিল একরকম ছেলেখেলা। কেউ এ খেলায় খেলোয়াড় বলে ওতরায়নি। অবশ্য ম্যাচও খেলা হত, কিন্তু ম্যাচ খেলার উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষে মারামারি করা। যে-দল হারত, তারা অপর দলকে আক্রমণ করত। আর যারা অপরের মাথা ফাটাতে পারত, তারা প্রসিদ্ধ হত।

চারপাশের গ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে অনেক ছোকরা পড়তে আসত। তাদের মধ্যে দেবগ্রামের ছেলেরা ছিল মারামারিতে ওস্তাদ। তারা ছিল শরীরে বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার। দেবগ্রামের আবহাওয়া বোধ হয় তখন খুব ভালো ছিল, এখন সে গ্রামে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান আড্ডা হয়েছে। নবদ্বীপের ছেলেরাও ছিল সব জোয়ান, আর কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ার ছোকরারাও ছিল অনেকে বীরপুরুষ। তাদের মধ্যে কান্তি নামে একটি যুবক ছিল। তার মতো সুন্দর লোক প্রায় দেখা যায় না। আর শরীরে বলবীর্যও ছিল অসাধারণ।

শেষটা কলেজের আদেশে জিমনাস্টিকের চলন হল। আমি জিম-নাস্টিক করতে পারতুম না, প্যারালেল বার-এ পিকক মার্চ করতে পারতুম না। আমার বাহুর সে জোর ছিল না।

কৃষ্ণনগরের নাবালক রাজার বদ্রি সুকুল নামে একটি সেতারশিক্ষক ছিল। সরকার বাহাদুর রাজকুমারের সঙ্গীতশিক্ষা বন্ধ করে তাকে জিম-নাস্টিক শিখতে আদেশ দিলেন। ওস্তাদজির চাকরি গেল। ওস্তাদজি প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকেই জিমনাস্টিকের মাস্টার করা হোক। তিনি এক মাসের মধ্যেই জিমনাস্টিক শিখে নেবেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। তিনি ছিলেন পালোয়ান। প্যারালেল বারে তাঁর তুল্য কেউ হতে পারতেন না। আমার

দেহের এই সব অক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমি একটি বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে ডন-মুগুর ও বৈঠক চর্চা করতে লাগলুম। এই ডন-মুগুরের প্রসাদে আমার দেহ গড়ে উঠল, বুক হল চওড়া ও কোমর হল সরু। তবে শরীরের শক্তি বাড়ল কি না বলতে পারিনে।

আমি কৃষ্ণনগরের কথা এত বেশি করে বলছি তার কারণ, উক্ত শহরই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে আর আমার মনের কাঠামো গড়েছে। এ ছাড়া, আমি একটি মফস্বল শহরের চেহারার কথাও বলেছি।

কৃষ্ণনগরে নবাবি আমলের সভ্যতার নিদর্শন, আর আমাদের নব সভ্যতার স্পষ্ট গুণ rationalism-এর পরিচয় ছিল। এখন বোধ হয় কৃষ্ণ-নগর অপর সব মফস্বল শহরের নকলে গড়ে উঠেছে, তার কোন বিশেষত্ব নেই।

আমরা অবশ্য কৃষ্ণনগরে শিকড় গেড়ে বসিনি। প্রথম-প্রথম প্রায় প্রতি বৎসর পুজোর সময়ে হরিপুর যেতাম। হরিপুর গ্রামটি খুব ভালো লাগত। আমাদের গ্রামের উত্তরে ছিল নদী ও দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড বিল— তিন-চার মাইল লম্বা— আর মাইলখানেক চওড়া, আর অসংখ্য পুকুর। অবশ্য বেত ও বাঁশের বনও ছিল— কেননা তখন চৌধুরী বংশের অনেকের বাড়ি-ঘর-দোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এ গ্রাম চাষার গ্রাম নয়, জমিদারের গ্রাম। গাঁয়ে কোন চাষার বসতি ছিল না। সমগ্র গ্রামটিতে ছিল শুধু চৌধুরীদের ও তাঁদের দৌহিত্রদের বসতি। সকলেই ছিলেন 'বাবু'দের দল— যাদের অন্যেরা মান্য করত। চৌধুরীরা খুব বড় জমিদার না-হলেও মাঝারি গোছের জমিদার এবং বহু কাল থেকে জমিদার ছিলেন।

আমাদের পরিবারের পুরুষেরা ছিলেন সুপুরুষ, আর আমার খুড়ি-জেঠিরা সব ছিলেন গৌরবর্ণ। আর প্রায় সকলই ছিলেন চালাকচতুর। তাঁদের ছিল হাসিমুখ ও কথায়-বার্তায় এঁরা হাসির চর্চা করতেন।

পরস্পরের ভিতর জমিজমা নিয়ে শরিকি বিবাদ ছিল। কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে তা প্রকাশ পেত না, বিশেষত পূজার সময়ে। আর বড়রা যথেষ্ট মদ্য পান করতেন, কিন্তু যুবকেরা নয়।

তখন গ্রামের স্বাস্থ্য ভালো ছিল, আর প্রায় সকলেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল। প্রতি বাড়িতে দুর্গাপূজা হত, হয় মোষ, নয় পাঁঠাবলি হত— নবমীর দিন ছেলে-বুড়ো মিলে পঙ্কোৎসব করত।

আমার মনে ও চরিত্রে শহরের ও পাড়াগাঁয়ের প্রভাব কতটা আছে

বলতে পারিনে, তবে দুইয়েরই কতকটা আছে। তার ফলে আমার মনে পরস্পরবিরোধী সংস্কার থাকা সম্ভব। তবে একটি বিষয়ে এ দু-জায়গায়ই মিল ছিল। আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু; তার অর্থ এই যে, হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশ মাত্র ছিল না। বিধিনিষেধ মানাই তাঁদের ছিল ধর্ম। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তাঁদের চরিত্রে একরকম ছিল না বললেই সত্য কথা বলা হয়। কেননা, তাঁরা ইংরেজি-শিক্ষিত ছিলেন না। কাশী ছিল তাঁদের প্রিয় শহর।

বৃদ্ধরা কাশী যেতেন দেহত্যাগ করতে, আর আমি আমার একটি জেঠতুতো ভাইকে দেখেছি যিনি কিছুদিন কাশীতে গিয়েছিলেন শিক্ষালাভ করতে। কীসের শিক্ষা জানিনে— কিন্তু শিখে এলেন শুধু তলোয়ার খেলা আর তীর-ছোঁড়া। আর হাতের গোড়ায় নাটোর তাঁদের ছিল একরকম শহর।

আমি ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরেই বাস করতুম সাড়ে-এগারো মাস ও হরিপুরে পনেরো দিন। কিন্তু হরিপুর আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম, তার মানসিক আবহাওয়াও।

তা ছাড়া, আমরা নদীয়া জেলাতেও এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার বয়েস যখন আট বৎসর, তখন বাবা দ্বারভাঙায় বদলি হলেন ও আমরা সপরিবারে সেখানে যাত্রা করলুম। কৃষ্ণনগর থেকে নৌকোয় মগরায় গেলুম, আর সেখানে গিয়ে রেলে চড়লুম। রাত্তিরটা ট্রেনে ঘুমিয়েছিলুম, সকালবেলায় মধুপুর পৌঁছলুম। পাহাড় সেই প্রথম দেখলুম, যদিচ অতি ছোট-ছোট। ক্রমে গরম বাড়তে লাগল। তখন বৈশাখ মাস। জসিদি স্টেশনে পৌঁছে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়লুম। কী ভীষণ গরম! আমি সেই থেকে গরম দেশকে বেজায় ভয় করি; সে ভয় আমার আজও আছে। এই গ্রীষ্মকাতরতাই আমার কর্মজীবনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

বাংলার তুলনায় বেহার আমার এতটা অপ্রীতিকর লাগে যে, তার একটু বর্ণনা করা আবশ্যক।

আমরা বাড়িতে তেতে-পুড়ে বেলা চারটের সময় বাড় স্টেশনে পৌঁছলুম, অর্থাৎ বিহারে পদার্পণ করলুম। সেকালে বাড় থেকে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে জনকরাজার দেশে যেতে হত।

বাড়ে গিয়ে শুনি, স্টিমার বাড় ছেড়ে গিয়েছে। অগত্যা আমাদের রাস্তার ধারে একটি মুদির দোকানে আশ্রয় নিতে হল। এক দিন এক রাত

Bangla Torrents

সেই খাপরার ঘরে থাকবার কথা, সেখানে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক ছিলুম। সেই সময়টুকুর মধ্যে ক্রমান্বয়ে 'রাম নাম সৎ হায়' এই ধ্বনি শুনলুম।

ইতিমধ্যে একটি বাঙালি ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনাদের এখানে থাকা হবে না— কেননা কলেরার মড়ক লেগেছে। আপনারা আমার বাড়িতে চলুন। আমার বাসায় নিচের তলায় একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে, সেই ঘরে আপনাদের সপরিবারে থাকতে ও খেতে দেব শুধু আলোচালের ভাত ও পাঁঠার মাংস, আর কিছুই নয়।

আমাদের দলবল বড় কম ছিল না। বাবা, মা, মাসিমা, আমরা দুটি ভাই, তিনটি বোন; আমাদের গৃহশিক্ষক দুটি কি তিনটি, আত্মীয় জন-তিনেক, চাকর আর একটি বাঙালি পাচক ব্রাহ্মণ, দেখতে অতি সুন্দর আর অতি বলিষ্ঠ। আমরা সদলবলে উক্ত বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হলুম ও তাঁর দত্ত ভাত আর পাঁঠার ঝোল খেয়ে মাটিতে বিছানা পেতে সে রাত্রি কাটালুম। সমস্ত দিন উপবাসের পর ও-খাবার আমাদের মুখে খুব ভালো লাগল। মা ও মাসিমা কী খেলেন জানিনে। কেননা, মা জীবনে কখনও মাংস ভক্ষণ করেননি, আর মাসিমা ছিলেন বিধবা। বোধ হয় সেদিন ছিল একাদশী।

তার পরদিন বেলা নটা-দশটায় গঙ্গায় স্নান করলুম। বাইরে আগুন জ্বলছে, আর গঙ্গার জল যেন বরফজল। আমরা উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ি দুপুরে আলোচালের ভাত ও পাঁঠার ঝোল খেয়ে বোধ হয় বেলা তিনটে-চারটের সময় স্টিমারে চড়ে গঙ্গা পার হলুম। উক্ত ভদ্রলোক ছিলেন শান্তিপুরের লোক, আর তাঁর উপাধি বোধ হয় প্রামাণিক। এই সহৃদয় লোকটি আমাদের অতিশয় যত্ন করেছিলেন। তাঁর ভদ্রতার স্মৃতি আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করছে।

গঙ্গা পার হয়ে আমরা আবার রেলে চড়লুম ও সন্ধ্যায় দ্বারভাঙায় নামলুম। পথিমধ্যে দেখলুম শুধু রোদে-পোড়া খাপরার চাল। এমন শুষ্ক ও নীরস দেশ ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। বাংলা দেশ সবুজ আর বিহার পাটকিলে। মনে আছে, মাঝে-মাঝে আমবাগান দেখেছি।

দ্বারভাঙায়ও সমান গরম। যে-বাসায় গিয়ে উঠলুম, সেটি গণ্ডকের খুব কাছে। গণ্ডকের জলও ঠাণ্ডা, তাতে স্নান করে সুখ হত। দিনটি গরমে ছটফট করে, সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরতুম। আমার পিসতুতো ভাই গান গাইতে শুরু করলেন। মা সে গান শুনে ভয় পেয়ে বাবাকে বললেন যে, প্যারীমোহন পশ্চিমে এসে হঠাৎ গাইয়ে হয়েছে! বাবা বললেন, ভয়

নেই, প্যারীমোহন মহুয়া খেয়ে গান গাচ্ছে। আর গরম সহ্য করবার জন্য মহুয়া খাচ্ছে। তিনি তখন 1st year-এ পড়তেন আর মধ্যে-মধ্যে মদ্য পান করা তাঁর অভ্যাস ছিল। আমরা মহুয়া পান করতুম না। সুতরাং দিনটে গরমে ভাজা হতুম। বাবার ইচ্ছে ছিল যাঁরা কলেজে পড়তেন তাঁদের পাটনায় পাঠিয়ে দিবেন আর যারা স্কুলে পড়ছে তাদের দ্বারভাঙার ইস্কুলে ভর্তি করবেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ খবর পেলেন যে পাটনায় ভয়ঙ্কর কলেরা হচ্ছে। তাই তিনি দাদা, মেজদাদা, সেজদাদা ও আমাকে কৃষ্ণনগর ফিরে যেতে আদেশ করলেন। এক হপ্তার মধ্যেই আমরা চার ভাই, মাসিমা, আমাদের গৃহশিক্ষক ও আত্মীয়দের সঙ্গে চাকর-বামুন নিয়ে কৃষ্ণ-নগরে ফিরে এলুম। আমরা গোয়াড়িতে নতুন বাসায় উঠলুম ও যে যে-ক্লাসে পড়তুম সে সে-ই ক্লাসেই রয়ে গেলুম। কৃষ্ণনগর এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আর বেহার থেকে নিয়ে এলুম তার গ্রীষ্মের স্মৃতি। বাবা আমাদের বাংলা দেশে পাঠিয়ে ভালোই করেছিলেন, কারণ যারা দ্বারভাঙায় রয়ে গেল, তাদের মধ্যে দু-জন আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী, উভয়েই কলেরায় আক্রান্ত হন। বোনটি সেখানে মারা গেল। আর ভাইটি ফিরে এলেন শুধু হাড় ও চামড়া নিয়ে। আমরা সাড়ে-তিন বৎসর গোয়াড়িতে বাসা ভাড়া করেছিলুম। তারপর দ্বারভাঙার দুর্ঘটনার দরুন বাবা কৃষ্ণনগরে সাহেবপাড়ায় একটি বাড়ি কিনে আমাদের সকলকে সেখানে রেখে গেলেন।

কৃষ্ণনগর সেকালে খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল। আমরা নিজেদের যে-বাড়িতে উঠে গেলুম পরে পাঁচ বৎসর সেই বাড়িতেই রইলুম ও সপরিবারে ভালোই ছিলুম। হঠাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হল। দাদা ও মেজদাদা কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সে ম্যালেরিয়া ভীষণ রূপ ধারণ করল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রতিদিন বিশ-ত্রিশ জন করে মারা যেতে লাগল। আমাদের বাড়িতে আমি ও আমার মা ছাড়া আর সকলে জ্বরে পড়লেন। জ্বর হলেই টেম্পারেচার ১০৫ ডিগ্রির নিচে হত না আর পনেরো দিনের কম ছাড়ত না। দাদা তখন বিলেতে ও মেজদাদা কলকাতায়। আমি তখন এনট্রান্স ক্লাসে পড়ছি ও দিব্যি সুস্থ ছিলুম। কৃষ্ণনগরের ম্যালেরিয়া আমাকে স্পর্শ করেনি। এই সময়ে একটি রবিবারে আমি গোয়াড়ি যাই একখানি খাতা কিনতে, অবশ্য পায়ে হেঁটে। প্রায় বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরি। পথিমধ্যে ভয়ঙ্কর মাথা ধরে, ফলে বাড়ি এসেই শুয়ে পড়ি।

তারপর চোখ খুলে দেখি আমার মেজদাদা যোগেশ চৌধুরী পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখানে এলে কবে? তিনি বললেন, শুধু আমি নই, দিদি আর মন্মথও এসেছেন আরা থেকে। আমি প্রশ্ন করলুম, কেন? মেজদাদা বললেন, তুমি আট দিন অজ্ঞান ছিলে, আজই শুধু তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তোমার অজ্ঞান অবস্থায় যে যেখানে ছিল সকলকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমি তো তবে ভালো হয়ে উঠেছি? তিনি বললেন, না। তোমার জ্বর ছেড়েছে! কিন্তু দুপাশের কর্ণমূল বেজায় ফুলে উঠেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, জলের হাওয়ায় সেরে যেতে পারে, তাই তোমাকে নৌকোয় নিয়ে যেতে হবে! আমি যখন জেগে উঠি তখন বিকেল পাঁচটা, আর সন্ধ্যে ছ-টায় আমাকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে নৌকোয় চড়ানো হল। সকালবেলা কালনায় পৌঁছতে আমার দুই কর্ণমূলের দুখানি পাঁউরুটি—প্রায় অদৃশ্য হল। তার পরদিন বলাগড় পৌঁছে দেখি কান-দুটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে আমরা সপরিবারে ট্রেনে চড়লুম আরা যাবার জন্য, আর তার পরদিন বেলা এগারোটা আন্দাজ ট্রেন থেকে নামলুম।

এ সব কথা বলছি কী কারণে, পরে বলব। আমার এত বড় রোগ হয়েছিল, আর গিয়ে দেখি তার কোন রেশ নেই। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন আহারান্তে দুপুরবেলায় একখানি ইংরেজি কাগজ পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলুম যে ইংরেজি অক্ষর পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি। ভয়ে আমার ঘাম হতে লাগল। বাবা পাশের একখানি খাটে শুয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রমথবাবু, তুমি ঘামছ কেন?' আমি বললুম, 'কৃষ্ণনগরের জ্বর বোধ হয় আজ পুরো ছাড়ছে।' এ কথা শুনে বাবা বললেন, 'বটে! দিব্যি খাচ্ছ-দাচ্ছ, হেসে খেলে বেড়াচ্ছ, আর জ্বর তোমার আজ ছাড়ল?' আমি বললুম, 'এ জ্বর বর্ণচোরা জ্বর।' এ কথা শুনে বাবা হেসে বললেন, 'ছেলে আমার তুখোড় বটে!' আমি আর কিছু বললুম না। কিন্তু মন স্থির করলুম যে, আর সাত দিন কোন ইংরেজি বই ছোঁব না। আর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' পড়তে লাগলুম। সাত দিন পরে Golden Treasury-র Songs and Lyrics পড়ে দেখি যে ইংরেজির জ্ঞান আবার বেবাক ফিরে এসেছে।

আমার যে কী ব্যারাম হয়েছিল তা আমি জানিনে। কেননা, তারপর চার বৎসরের মধ্যে আমার একদিনও জ্বর হয়নি। Sunstroke হতে পারে

কিন্তু তার ফলে কর্ণমূল ফুলবে কেন? আর তার ফলে ইংরেজি ভাষার স্মৃতি লোপ হবে কেন ও আট দিন অচৈতন্য থাকব কেন?

আমার ইন্দ্রিয় সব সজাগ ছিল, কেবল মনের একাংশ সাময়িক ভাবে লুপ্ত না-হোক, সুপ্ত হয়েছিল।

২

কী কুক্ষণেই আত্মকথা লিখতে বসেছি! প্রথম থেকেই লেখায় পদে-পদে বাধা পড়ছে।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলেন, যে-রোগে শেষটা তাঁর মৃত্যু হয়। এ কথা আমি পূর্বে বলেছি।

তারপর উপর্যুপরি নানা পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হল। ফলে বিপর্যস্ত মন নিয়ে মধ্যে-মধ্যে কলম চালিয়েছি।

কতকটা এগিয়েছি, এমন সময়ে বর্তমান যুদ্ধ আমাদের গা ঘেঁষে এল। আমি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বলা বাহুল্য, মরুভূমির ভিতর ওয়েসিস আমরা ইচ্ছে করলেই গড়ে তুলতে পারিনে। বাইরে শান্তি থাকলেও মনে শান্তি থাকে না। এখানে সঙ্গীতের ও কলা-বিদ্যার চর্চা করা হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে সঙ্গীত ও শিল্পকলার কোন সার্থকতা থাকবে কি না জানিনে। জার্মানি সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও জাপান চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী। অথচ এ দুই জাতই এ দুই বিদ্যার ধ্বংসসাধন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। দেশ যখন ওলট-পালট হতে বসেছে, তখন আত্মকথার কোন সার্থকতা নেই। আমি লিখতে পারি, কিন্তু পড়বে কে?— সাহিত্য হচ্ছে অর্ধেক সঙ্গীত, অর্ধেক চিত্রকলা— এই কথাটা মনে রাখবেন। আর-এক মুশকিল। গত সংখ্যায় 'রূপ ও রীতি'তে আত্মকথা পড়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ছাপার অক্ষরে এত ভুল পূর্বে কখনও দেখিনি। 'রূপ ও রীতি'র পরিচালক আমাকে লিখেছেন যে— প্রথমত কাগজ পাওয়া যায় না, তারপর লোকও পাওয়া যায় না। আজ যে কাজ করে, কাল সে অদৃশ্য হয়। এ অবস্থায় ছাপার অক্ষরের পক্ষে হাতের লেখার অনুসরণ করা অসম্ভব। যুদ্ধের আঁচ লেগেই যখন ছাপাখানার এ রূপ

অবস্থা, তখন যুদ্ধের আগুন জ্বললে তার অবস্থা কী হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাগজ সহজেই পোড়ে।

আমাদের দেশ পরাধীন দেশ, আর পরাধীনতায় আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই। ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বাধীন হতে চাই। অপর পক্ষে আমরা অধীনতায় অভ্যস্ত হয়েছি। আর এমনি অভ্যস্ত হয়েছি যে আমাদের কাজকর্ম, কথা-বার্তার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের অধীনতা। মানুষ সব অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, আমরাও নিয়েছি। এই অধীনতার ধাত বদলাতে আমরা ভয় পাই, বিশেষত যখন নূতন অধীনতা ধ্বংসমূলক। ভাবনা এখন ভবিষ্যতের জন্য, অতীতের জন্য নয়। আর আমার আত্মকথা অতীতের কথা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিয়ে আত্মকথা লেখা একরকম অসম্ভব। জীবনের খেই হারিয়ে যায়।

তা হলেও আমি তেরো বৎসর বয়সে আবার পদার্পণ করি।

বেহার আমার পূর্বপরিচিত। আমি যখন সিক্সথ ক্লাসে পড়ি, তখন আমি গ্রীষ্মকালে দ্বারভাঙায় যাই। তখন বেহার ছিল একটা বিভীষিকা, সে কথা পূর্বে বলেছি। তারপর যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, তখন শীতকালে মজঃফরপুরে যাই। এ শহরটি আমাকে মুগ্ধ করে। যদিও সন্ধ্যেবেলায় ঘরে আঙ্গুটি জ্বালাতে হত। আমাদের কাছে ওটি ছিল একটি বাঙালি শহর। আমি শহরের যে-অংশ দেখি, সেটি ছিল অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার উপর সেখানে ঘোড়দৌড় হত। দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়িতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আয়না ঝোলানো থাকত; আর শহরের আশেপাশে দেদার আম-লিচুর গাছ ছিল। সেখানে দু-একটি ছোকরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার ভিতর কানাই নামে একটি ছোকরার কথা আজও মনে আছে। ছোকরাটি ছিল দেখতে ভালো ও বেজায় স্ফূর্তিওয়ালা। শুনেছি, কানাই পরে মোক্তার হয়েছিল ও বড় মোক্তার হয়েছিল। কিন্তু অল্পবয়সে মদ খেয়ে মারা যায়। আমার মতে, বেহার গ্রীষ্মকালে নরক আর শীতকালে স্বর্গ।

তারপর যখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি, তখন শীতকালে ভাগলপুর যাই। ভাগলপুরও তখন ছিল একরকম বাঙালি শহর।

ভাগলপুরের বড়-বড় উকিলরা ছিলেন সব বাঙালি, যথা সূর্যনারায়ণ সিং, শিবচন্দ্র, অতুল মল্লিক প্রভৃতি। ভাগলপুরে সে সময়ে উকিলবাবুরা বেজায় মদ্যপান করতেন, একমাত্র সূর্যনারায়ণ সিং ছাড়া। ভদ্রলোক একটি চমৎকার বাড়িতে বাস করতেন; শুনেছি সেটি পূর্বে গবর্নরের বাড়ি ছিল।

ভাগলপুর তেমন সুদৃশ্য শহর ছিল না। তার পশ্চিমে ছোট একটি পাহাড়ের উপর Cleveland House নামে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল। নিচে গঙ্গা, উপরে পাহাড়— জায়গাটা ছিল মনোরম। এখন সে বাড়ির মালিক পাথুরেঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরবংশ। এইখানেই অতুল মল্লিকের পুত্র বসন্ত মল্লিকের সঙ্গে পরিচিত হই; পরে তিনি I C S পাস করে পাটনার জজ হন। মল্লিকমহাশয়ের অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গেও কলকাতায় আমি বিশেষ পরিচিত হই। তাঁদের সঙ্গে আমি একসময়ে বিলেতে ছিলুম।

আরা ছোট শহর, মজঃফরপুর ও ভাগলপুরের মতো বড় নয়। কিন্তু অতি স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি প্রায় চার মাস সে শহরে বাস করি, কিন্তু আমাদের পরিবারে কারও একদিনের জন্যও অসুখ করেনি। আর আমরা সকলেই অতি মোটা তাজা হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলুম। সেখানে আমরা ডিসেম্বর মাসেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করতুম, কিন্তু একদিনের জন্যও সর্দিকাশিতে ভুগিনি। আরা হিন্দুস্থানি কায়স্থপ্রধান জায়গা। লালারাই সে শহরের প্রধান সম্প্রদায় ছিল। তাদের পয়সা ছিল, তার প্রমাণ পেতুম তাদের অসম্ভব রকম স্ফীত উদরে। এত পেটমোটা লোক আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। এত বিশাল উদর নিয়ে এরা যে কী করে কাজকর্ম করে বুঝতে পারতুম না। ডাল-রুটি খেয়ে-খেয়ে মানুষ যে ভাঁটার মতো গোলাকার হতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আরা সেকালে বাঙালি-প্রধান শহর ছিল না। সেখানে দুটি মাত্র বাঙালি ভদ্রলোক দেখি— কৈলাসবাবু নামক একটি উকিল ও আমার বন্ধু সোমনাথ মৈত্রের ঠাকুর-দাদা চন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি ছিলেন আরা স্কুলের হেডমাস্টার। কৈলাসবাবুর পুত্র ব্যারিস্টার নলিনী বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার বিলেতে পরিচয় হয়। সে ছিল অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সহৃদয় লোক।

আরায় সন্ন্যাসীদের একটি সদাব্রত ছিল। অসংখ্য সন্ন্যাসী সেখানে দু-এক দিন থেকে স্থানান্তরে চলে যেত। আমাদের বাসা ছিল লহরের (canal) পাশে। সাধুবাবাজিরা লহরে স্নান করতে আসত ও তাদের শিঙ্গারপটার করতে ঘণ্টাখানেক লাগত। স্নান করে উঠে তারা এক ঘণ্টা ধরে ছাই মাখত ও কেশবিন্যাস করত। চুল মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধত। ফলে তাদের আর শীত লাগত না।

আরায় একটি বাড়ি ছিল যেখানে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজরা আশ্রয় নিয়েছিল ও নিজেদের রক্ষা করেছিল। আমরা যখন আরায় যাই, তখনও সে বাড়ির দেওয়ালে গুলির দাগ ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের বছর-

পঁচিশ বাদে আমরা আরায় যাই ও সে বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কোন-কোন লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়; ব্রাহ্মণ, ছত্রী, আহীর, ছুতোর, কামার প্রভৃতি। লালারা অবশ্য এ যুদ্ধে যোগ দেয়নি। আরার আহীররা ছিল সকলেই দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। ছত্রীরাও তাই। এদের মুখে মিউটিনির গল্প শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগত। কুমার সিংহ এদের সকলেরই ছিল আদর্শ হিরো।

আরা থেকে আমরা আর কৃষ্ণনগরে ফিরলুম না, এলুম কলকাতায় বসবাস করতে অর্থাৎ পড়তে; যেমন আমরা কৃষ্ণনগরে বসবাস করতাম সেখানে পড়তে। ছেলেরা যাতে M A, B A পাস হয়, বাবার সেদিকে খুব ঝোঁক ছিল।

কলকাতায় যখন ফিরলুম, তখন আমার বয়েস সাড়ে-তেরো বৎসর। তখন আমি নতুন মানুষ। দেহ হয়েছে সুস্থ, সবল ও সুঠাম; আর মনের মোড় ফিরে গিয়েছে। আমি অঙ্ক কষতুম ভালো, ক্লাসের পরীক্ষায় একশ মার্কের ভিতর অন্তত নব্বই পেতুম। যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন আমি Wood's Algebra-র সব equation সহজেই কষতে পারতুম— যা আমার গৃহশিক্ষক মোটেই পারতেন না। অঙ্ক কষারও একটা instinct আছে, সকলের থাকে না।

কিন্তু আরা থেকে যখন ফিরে এলুম, তখন অঙ্কের প্রতি আমার কোন অনুরাগ ছিল না। তখন সাহিত্য আমার প্রিয় হয়েছিল। Bulwer Lytton-এর নভেল, George Eliot-এর Adam Bede আর Golden Treasury-র Songs and Lyrics আমি উলটেপালটে পড়তুম। কেননা, আরায় এই জাতীয় বই সব আমাদের বাড়িতে ছিল। আজ যে আমি সাহিত্যিক, সে ঐ রোগ-আরোগ্যের গুণে।

ইতিপূর্বে কলকাতা শহরের শুধু নামই শুনিনি, চোখেও দেখেছিলুম। আমার বয়েস যখন নয়, তখন এক বেলার জন্যে কলকাতা এসেছিলুম। এসে পৌঁছই দুপুরবেলা আর সন্ধ্যের পরই ফিরে যাই। কলকাতায় দেখলুম রাস্তা চওড়া, সন্ধ্যের পর রাস্তায় আলো আছে। কিন্তু সেখানে টিকতে পারলুম না দুর্গন্ধের চোটে। কৃষ্ণনগরের গায়ে বিকট গন্ধ ছিল না।

তারপর দশ বৎসর বয়সে কলকাতায় আসি মজঃফরপুর যাবার পথে। এবারও দেখি খাবারে গন্ধ। গন্ধ আসে কোত্থেকে? সেকালে উনুনে কাঁচা কয়লা পোড়ানো হত। তারপর বারো বৎসর বয়সে আবার কলকাতা এসে তিন-চার দিন থাকি, ইডেন হসপিটাল লেনে। তখন এ গলিটিকে

চাঁপাতলা লেন বলত। সে বাড়িতে নদে জেলার অনেক যুবক ছিলেন। তাঁরা ডাক্তারি পড়তেন। ফলে বাসাটি ছিল মড়ার হাড়ে ও খুলিতে ভর্তি।

আমি যখন কলকাতায় পড়তে এলুম, তখন আমরা নিমু খানসামার গলিতে একটি বাসায় উঠলুম। সে রাস্তা এখন ইডেন হসপিটাল-ভুক্ত হয়েছে। কলকাতায় তখন বিশেষ গন্ধ পাইনি। কিন্তু নিমু খানসামার গলিতে বেশি দিন থাকতে পারলুম না— গলির দোষে নয়, বাড়ির দোষে।

আমাদের কৃষ্ণনাগরিক বন্ধুরা এ বাড়ি আমাদের জন্য ভাড়া করেছিলেন। মাসখানেক পরে বৈঠকখানা বাজার রোডে একটি বাড়িতে উঠে গেলুম। বাড়িটি ছোট, কিন্তু বাসযোগ্য। সে বাড়ির পূর্বে ছিল মুসলমান বস্তি, আর পশ্চিমে ছিল খ্রিস্টান ভদ্রলোকদের বাসা। বছরখানেক সেখানে থাকি। তারপর বছর-দুয়েক হুজুরিমলের গলিতে উঠে যাই।

এবার কলকাতা আমাদের ভালো লেগেছিল; কারণ এ শহরে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, সংক্রামক রোগও ছিল না। তারপর গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণনগরের মতো গরমও ছিল না। সন্ধ্যের সময়ে দিব্যি দক্ষিণে হাওয়া বইত— যে-হাওয়া কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যেত না। আমরা সন্ধ্যেবেলায় গোলদীঘির ধারে গিয়ে আরামে বসে থাকতুম।

আমি কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হই এবং এনট্রান্স ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করি। কলকাতার স্কুল-কলেজের কথা পরে বলব। স্কুলের বেশি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। যারা সন্ধ্যেবেলায় গোলদীঘিতে হাওয়া খেতে যেত, তাদের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়। তাদের দু-এক জনের নাম আমার আজও মনে আছে। পূর্ণ আড্ডি বলে হুগলীর একটি ছেলে ছিল। ভালো ছেলে। আর-একটি ছেলে আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে ওঠে, তার নাম গোকুল চাটুয্যে। সে লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, কিন্তু জিমনাস্টিকে সকলের সেরা ছিল। ছোকরাটি ছিল অতি বলিষ্ঠ ও দিলদরাজ। থাকত কালী সিংহির গলিতে। কী জন্য সে আমার বন্ধু হয়ে ওঠে, তা পরে বলব। আরও জনকতক ধনীসন্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি।

হেয়ার স্কুলে আমার সহপাঠীদের সঙ্গে হেমচন্দ্র খাস্তগীর এখনও বর্তমান। স্কুলে তিনি আমাদের চোখে পড়েননি, কিন্তু পরে তিনি কৃতী হয়েছেন। নীলু দত্ত নামে একটি গন্ধবণিক ছোকরার সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। ছোকরাটির ছিল মস্ত বড় চোখ, নানা রকম ঠারঠোর দেখাতে পারত।

আমরা পদ্মাপারের বাঙাল এবং ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরে থাকলেও আহার সম্বন্ধে দেশের আহারেই অভ্যস্ত ছিলুম। আরায় হিন্দুস্থানি বাবুর্চির হাতে ডাল-রুটি ও মাংস ছিল খুব মুখরোচক ও পুষ্টিকর আহার।

কলকাতায় এসে আমাদের কলকাতার আহার মনঃপূত হত না। ঝাল আমাদের মুখে মিষ্টি লাগত। সুতরাং ঝাল বেশি খেতুম। মাস-দুই পরে আবিষ্কার করলুম যে আমাদের বুকজ্বালা করছে। আমরা ভাইরা পরামর্শ করে আহারে ঝালের মাত্রা কমিয়ে দিলুম, বুকের জ্বালাও কমল।

সে যা-ই হোক, আমাদের স্বাস্থ্য কলকাতায় ভালো ছিল। আমরা যখন কলকাতায়, দাদা তখন বিলেতে, বাবা পশ্চিমে; সুতরাং আমরা ছেলেরাই হয়েছিলুম বাড়ির কর্তা। তার ফলে সাংসারিক হিসেবে আমাদের চোখ-কান খুলে গেল। আমরা ছোকরা বয়সেই গৃহস্বামী হয়ে উঠি।

আমি আমার কলকাতা-বাস এবং এই শহরে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্য লিখতে বসেছি। কিন্তু আজকের দিনে কলকাতার ভগ্ন-দশায় সে বিষয়ে কিছু বলতে মন সরছে না। কৃষ্ণনগরে জনৈক ডাক্তার-বাবুর মুখে শুনেছিলুম যে, সেকালে ইউরোপে প্লেগ বলে একটি ভীষণ মারাত্মক রোগ ছিল। আমি বড় হয়ে কলকাতা শহরে প্লেগের প্রকোপ দেখেছি।

আজ দু-বৎসর থেকে air-raid-এর কথা শুনছি। কিন্তু কলকাতায় যে air-raid হতে পারে, তা কখনও ভাবিনি। আজকাল শুনছি জাপানিরা নাকি আমাদের মাথায় বোমাবর্ষণ করবে। ফলে বিজলি বাতি উদ্ভাসিত কলকাতা থেকে বহু লোক পলায়ন করেছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। কলকাতার এই কৃষ্ণপক্ষ কেটে না-গেলে ভারতবর্ষের রাজধানীতে হয়তো ফিরব না। এ অবস্থায় লিখতে কি মন সরে?

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, সাড়ে-তেরো বৎসর বয়সে আমি কলকাতায় পড়তে আসি; চিড়িয়াখানা দেখতেও নয়, যাদুঘর দেখতেও নয়। পৃথিবীর অপর দেশের বহু জীবজন্তুর ছবি আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাদের সশরীরে দেখবার আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। আর যাদুঘরে সেকালে ছিল অধুনালুপ্ত সেকেলে অতিকায় জীবদের কঙ্কাল মাত্র। সেই সব হাড়ের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবারও কোনরূপ লোভ আমার ছিল না।

আমি কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে এনট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হই। সে-কালে বোধ হয় ট্রান্সফারের কোন হাঙ্গামা ছিল না। হেয়ার স্কুলে শিক্ষার

ব্যবস্থা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের চেয়ে ঢের ভালো ছিল। যদিও ইস্কুল-বাড়িটি সে কলেজের তুলনায় ক্ষুদ্র, আর সেরকম দর্শনধারী মোটেই ছিল না। ঘরগুলি ছিল ছোট ও বিশেষত্বহীন। কৃষ্ণনগর কলেজের ঘরগুলি ছিল প্রকাণ্ড উঁচু, আর তার দেওয়ালগুলি ছিল অতি সুন্দর পঙ্খের কাজ করা, ডিমের খোলার মতো তার চেহারা। পরে তা জনৈক ইংরেজ প্রিন্সিপালের মনঃপূত না-হওয়ায় তিনি মানুষের মাথার সমান মাপে আলকাতরা দিয়ে দেওয়াল ঢেকে দিয়েছিলেন। আমার সে বয়সেও মনে হয়েছিল এরই নাম বিলাতি vandalism. আর সে কলেজের হাতা ছিল বিরাট, যাতে ইচ্ছে করলে এক ডজন ফুটবল খেলার মাঠ হতে পারত। হেয়ার স্কুল ছিল রাস্তার ধারে, প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণে। মাঝখানে একটু সঙ্কীর্ণ জমি ছিল, যেখানে টিফিনের সময়ে স্থূলকায় ছাত্রেরা বাড়ি থেকে পাঠানো বাটি-বাটি দুধ খেত। এ ব্যাপার আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি বলে আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকত। যাদের বাড়ি থেকে দুধ আসত না, সে সব ছেলে উক্ত দুগ্ধপায়ীদের নানা রকম ঠাট্টাবিদ্রূপ করত, যথা : 'বাড়ি থেকে মা-কে সঙ্গে নিয়ে এলেই তো বেশ কোলে বসে দুধ খেতে পারতিস!'

যাক এ সব কথা!

ভোলানাথ পাল তখন হেয়ার ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি ইংরেজি চমৎকার পড়াতেন। সত্য কথা বলতে গেলে, ইংরেজি ভাষার phrases and idioms-এর সঙ্গে তিনিই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেকেন্ড মাস্টারের নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন চেহারায় হেডমাস্টারের ঠিক বিপরীত। তাঁর নাক ছিল বাঁশির মতো, আর চোখ চকচকে। আর ছিল লম্বা পাকা দাড়ি, তার প্রথম অংশটা তামাটে, তারপর সাদা। ছেলেরা বলত তিনি গাঁজা খান। বোধ হয় তাঁর শ্মশ্রুর ঐ তাম্রবর্ণ দেখে। তাঁকে ছেলেরা অত্যন্ত ভয় করত, যদিচ আমি তাঁকে কখনও কাউকে কড়া শাসন করতে দেখিনি। তাঁর একটি কথা আমার আজও মনে আছে। তিনি হেডমাস্টারকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, কেশব কাল সখী হয়ে নৃত্য করেছেন, এর পর বোধ হয় ব্রাহ্মরা সকলে বোষ্টম হয়ে গড়াগড়ি করবে। স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব পাঁচটি ছাত্র হেয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লালগোপাল চক্রবর্তী। সে ছিল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি বলিষ্ঠ ও পড়াশোনায় খুব ভালো। লাল-

গোপালের মৃগীরোগ ছিল। ক্লাসে এসে কখনও-কখনও অজ্ঞান হয়ে যেত, মাস্টাররা সব ভীত হয়ে পড়তেন। আমরা কৃষ্ণনাগরিকরা মাথায় একটু জল দিয়ে পাঁচ মিনিটেই তাকে সজ্ঞান করতুম। পণ্ডিতমশায় আমাদের কখনও ভালো নজরে দেখেননি। কেন জানিনে। বিশেষত আমার উপর তাঁর যেন একটা আক্রোশ ছিল। যদিচ আমরা ক্লাসে অতি ভালোমানুষ ছোকরা ছিলুম। তাঁর একটি ব্যবহার আমার আজও মনে আছে। এনট্রান্স পরীক্ষার মাসখানেক পরে আমি ও আমার বন্ধু গোকুল চাটুয্যে একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পণ্ডিতমশায় অপর ফুটপাথে কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি রাস্তা পার হয়ে আমাদের ফুট-পাথে এলেন। এসে প্রথমেই বললেন, 'কী হে চৌধুরী, খুব বাবু সেজে বেরিয়েছ যে!' আমি বললুম, 'হয়তো তাই।'

— পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে, তা বোধ হয় জানো?

— হাঁ, পণ্ডিতমশায়, জানি।

— পাস, না ফেল?

— পাস।

— তুমি পাস!

— হাঁ, ফার্স্ট ডিভিশনে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি না-করে অপর ফুটপাথে চলে গেলেন। বছর-চল্লিশ পরে আমি তাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়েছিলুম। যদিচ বীরবল ইতিমধ্যে তাঁকে ঠাট্টাঠুট্টি করে লিখেছিল।

হেয়ার ইস্কুলে থাকতে আমি কলকাত্তাই ছেলেদের প্রতি তেমন অনুরক্ত হইনি। তাদের কথাবার্তা ছিল বিরস, তাদের ভাষা ছিল খেলো, আর তাদের রসিকতা সব বস্তাপচা। তাদের মধ্যে একটি ছোকরা— গোকুল চাটুয্যের আমি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠি। আমি একদিন ক্লাসে ঢুকছি, এমন সময়ে বিনোদ গুপ্ত নামে দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটি ছোকরা আমাকে কোন একটি নামে সম্ভাষণ করে, যা আমার কানে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। আমি তার গালে এক চপেটাঘাত করি; যদিচ আমি তখন বালক, আর গুপ্তজা যুবক। অমনি তার দলবল আমাকে মারতে উদ্যত হয়। এমন সময়ে গ্যালারি থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললে, যে প্রমথ চৌধুরীর গায়ে হাত দেবে, তাকে আমি খুন করব। ছোকরাটি ছিল ক্লাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট আর অতিশয় শক্তিশালী। আমি তাকে পূর্বে চিনতুম না; এই ঘটনায় তার সঙ্গে আমার পরিচয়

হল। তারই নাম গোকুল চাটুয্যে। পরে সে আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। উপরন্তু, সে আমার ফাইফরমাশ খাটত। বড়বাজারে আমার সঙ্গে যেত, কাপড় কিনে দেবার জন্য। আমার পরিচিত একটি ছোকরা তার বাড়িতে জোড়াবাগানে নিয়ে যেত। হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিত ছিলুম। আমি একটি ছোকরাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি— এ নামের অর্থ কী? সে বলে, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" পড়োনি?' আমি বলি, 'না।' সে বলে, 'একখানি "ভগ্নহৃদয়" কিনে পড়ো, তা হলেই জানতে পারবে যে ললিতার সঙ্গে তোমার কী মিল আছে।' তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

আমি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে মুগ্ধ হইনি, এবং ললিতার সঙ্গে আমার মিল কোথায়, তা-ও বুঝতে পারিনি। 'ভগ্নহৃদয়'-এ দুটি-চারটি প্রাকৃতিক বর্ণনা আমার খুব ভালো লাগে। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান ইস্কুলের ছেলেরা গাইত। তার প্রথম কথাগুলি 'প্রেমের কথা আর বোল না।' শুনলুম এর সুরের নাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। ঝিঁঝিট আমি জানতুম, কিন্তু ইটালিয়ান ঝিঁঝিট কাকে বলে জানতুম না। এর থেকে আমার ধারণা হয় যে, কলকাতার ছেলেরা সঙ্গীতছুট। পরে অভিজ্ঞতায় সে মতামত আমার দৃঢ় হয়েছিল। কেন, সে কথা পরে বলব।

এর পর আমি হেয়ার ইস্কুলের উত্তরের মাঠ পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলুম। কলেজ হচ্ছে মনোজগতে একটি নতুন রাজ্য। আমার ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলে পড়া বিদ্যে ইংরেজি স্কুলেও আমার সহায় হয়েছিল। কলেজে এসে দেখি সে বিদ্যেতে আর কুলোয় না। ইতিহাস পড়তে হল রোমের আর গ্রিসের। অঙ্ক, ট্রিগনমেট্রি, কনিক সেকশন প্রভৃতি শিখতে হল। লজিক নামে একটা নতুন শাস্ত্র শিখতে হল। আর তখন ফার্স্ট আর্টসে ফিজিক্স পড়তে হত। এ ফিজিক্স আমার কাছে একটা যাদুবিদ্যা বলে মনে হত। কলেজে আমাদের ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন এলিয়ট সাহেব। তিনি ছিলেন senior wrangler, গণিতবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি experiment ভালো করতে পারতেন না। কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে বস্তুর গতিবিধি সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে আমি ফিজিক্সের অতি ভক্ত হয়ে পড়ি। এলিয়ট সাহেব ব্যতীত অপর কোন শিক্ষকের কথা আমার মনে নেই— দুটি ছাড়া। হরিশচন্দ্র কবিরত্ন ছিলেন আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র এবং সুরসিক ব্যক্তি।

তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়ে আমরা সুখ পেতুম। আর বিপিন গুপ্ত ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক, তিনি ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রাণবান। তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে বদলি হয়ে প্রেসিডেন্সিতে এসেছিলেন। সে কারণ, ছেলেদের একটু সমীহ করতেন। এ কথা তিনি আমাকে বহু কাল পরে বলেছেন। তা ছাড়া, এ কলেজে জনকতক পয়লা নম্বরের ছেলে ছিল, যারা এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম দশজনের শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল। তাদের ভিতর প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন। আর আমার যত দূর মনে পড়ে, সিভিলিয়ান কিরণ দে-র দাদা সতীশ দে আর-একজন, যিনি পরে বর্ধমানে ডাক্তারি করে সেখানে প্রভূত অর্থ এবং খ্যাতি অর্জন করেন। আর সূর্যকুমার কারফরমা নামক আর-একটি ছোকরা ছিল, যে পরে শুনেছি আগ্রা কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়। কোন হিন্দুস্থানি যুবক আমাকে পরে বলেন যে, তাঁর তুল্য অধ্যাপক সে কলেজে আর কেউ ছিল না। অনুকূল দাসগুপ্ত বলে আর-একটি ঘোর ব্রাহ্ম যুবক ছিল, যে পরে বিলেতে গিয়ে ভেস্তে যায়।

আমার অবশ্য এ দলের ছোকরাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না। হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলের ছেলেরা ঘরে ঢুকতেই ডান ও বাঁ-পাশের বেঞ্চি অধিকার করে বসত। হিন্দু স্কুলে নারায়ণপ্রসাদ শীল নামক একটি ছোকরার সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়; তিনি আজও বর্তমান। তিনি আমাকে গায়ক লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি ক্রমে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন। লালচাঁদ অল্পবয়স থেকেই গান গাইতেন; এস্রাজ,, হারমনিয়ম ও বাঁয়া তবলা বাজাতেন। পরে তিনি একজন গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। তাঁর গলা ছিল জাঁদরেলি, আর বাজনায় হাত ছিল কড়া। পরে দুই-ই অনেকটা মোলায়েম হয়ে আসে। আমি সেকালে একটি সহপাঠীকে হারমনিয়ম শিক্ষা করতে দেখি। তিনি 'বউ আমাকে কাটনা কেটে কিনে দেবে বাজনা,' এই বাহারের গৎটি মকসো করতেন। লোককে বানান করে পড়তে শুনলে যে-রকম হাসি পায়, তাঁর এই বাদ্যশিক্ষার পদ্ধতি আমার তেমনি হাস্যকর মনে হত। আমি পূর্বে বলেছি যে কলকাতার ছেলেরা ছিল সঙ্গীতছুট। সেকালে দুটি গান রাস্তাঘাটে সকলেই গাইত, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান থেকে ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত। সে দুটি হচ্ছে— 'আয় লো অলি কুসুম তুলি,' আর 'যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।' ভাবে ও ভাষায়, সুরে ও তালে এমন খেলো গান আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। রবীন্দ্রনাথের গান তখন কেউ জানতও

না। লালচাঁদ অবশ্য এ সব গান গাইত না। সে গাইত সেকালে প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগৃহীত আদি ব্রহ্মসঙ্গীত সে জানত। লালচাঁদের ঠাকুরদা প্রেমচাঁদ বড়াল ছিলেন একজন আদি ব্রাহ্ম, তাঁদের বাড়িতে হপ্তায় একদিন যে-সমাজ হত, তাতে লালচাঁদকে অল্পবয়স থেকে গান গাইতে হত। আমি তার সঙ্গে মিশে বহু গানবাজনার আসরে উপস্থিত থাকতুম। আমার মনে আছে যে, আমি লালচাঁদের সঙ্গে মহেন্দ্র চাটুয্যে নামক জনৈক প্রসিদ্ধ হারমনিয়াম-বাদকের বাড়িতে গিয়েছি। তাঁর বাজনা আমার ভালো লাগেনি। যদিচ অনেকে আহা-উহু করেছিল। তিনি ছিলেন ধনী নন, কিন্তু ঘোর বাবু। শুনেছি সেকালে গোলাপজলে স্নান করতেন। পরে তিনি নোট জাল করে আন্দামানে যান। সেখান থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। চেহারা তাঁর একই ছিল, কিন্তু তিনি তখন আর গুণী ছিলেন না।

আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে আর-একটি যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নাম জ্ঞানদা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙার বড় জমিদারের পুত্র। তিনি ছিলেন চেহারায় আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, চোখ নীল আর চুল কটা। এমন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মহাভুজ পুরুষ বাঙালির মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি Wards Institution-এর ছাত্র ছিলেন। আর শিখেছিলেন কুস্তি করতে, ঘোড়ায় চড়তে ও সেতার বাজাতে। প্রথম-প্রথম আমি তাঁর সঙ্গীতচর্চার কোন পরিচয় পাইনি। পরে তিনি বাংলার ভিতর শ্রেষ্ঠ সুরবাহার-বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। এবং আমাদের পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। সে অনেকটা আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরীর প্রসাদে। সেজদা ছিলেন শিকারমত্ত, আমি ছিলুম সঙ্গীত-ভক্ত। এই দুই কারণে জ্ঞানদার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে ওঠে। আর সে বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট থাকে।

ফার্স্ট ইয়ারের সহপাঠীদের নারায়ণপ্রসাদ শীল ও জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কারও সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব টেকসই হয়নি। তা যে হয়নি, তার কারণ ভালো ছেলেদের কোন দল ছিল না। তারা সকলেই ছিল স্ব-স্ব প্রধান ও গম্ভীর প্রকৃতির। তা ছাড়া, জনকতক ধনী ছেলে এবং জামাইও ছিল। তারা যে কী জন্য কলেজে ভর্তি হয়েছিল, তা আমি জানিনে; সম্ভবত আর পাঁচজনকে নিজেদের বেশভূষার বাহার দেখাতে। এ দলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।

তারপর সেকেন্ড ইয়ারে উঠলুম। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দু স্কুল থেকে আমাদের কলেজে এসে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলেন। তাঁর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। তিনি সেই বয়সেই কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতা করতেন। তিনি পরিণত বয়সে চমৎকার বক্তা হয়ে ওঠেন, বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই। তিনি বোধ হয় আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। আজও তিনি নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। এই দু-তিন বৎসর কলিকাতা-বাসের ফলে আমার এ শহরের প্রতি মায়া জন্মায়। সেটা আমি আবিষ্কার করি আমার কলকাতা ত্যাগ করবার সময়ে। আমি কী জন্য কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হই, তা পরে বলব।

আমি আবার কৃষ্ণনগর ফিরে যাই; সেখানে গিয়ে কলকাতার অভাব অনুভব করি। কৃষ্ণনগরে প্রথমে বাড়িতে ভালো করে ফুলের বাগান করতে প্রবৃত্ত হই। আমাদের পূর্বোক্ত গৃহশিক্ষক আমাদের বাড়িতে এসে অধিষ্ঠান করেন, শিক্ষক হিসেবে নয়, সরকার হিসেবে। তিনি আমাকে বাগান করার অপব্যয় থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য হননি। আমার সেজদা কুমুদনাথ ছিলেন অতি রোখালো মেজাজের লোক। আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তিনি তখন থার্ড ইয়ারে পড়েন। তার সহপাঠী জনৈক গোবেচারি ছোকরা ক্লাসে বসে পান চিবোচ্ছিল। অধ্যাপক ওয়েব সাহেব তাই দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছোকরাটিকে বাইরে গিয়ে মুখের পান ফেলে আসতে আদেশ করেন। সে যখন বেরিয়ে যায়, ওয়েব সাহেব তাঁর পিছন-পিছন ছোটেন। সাহেবের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য সেজদাও সেই সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়েন। ওয়েব সাহেব প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করেন যে, সেজদা তাঁকে মারতে গিয়েছিলেন। তার বিচার হয় ও তাতে সাব্যস্ত হয় যে, সেজদা বাস্তবিকই সাহেবকে মারতে যান। অবশ্য ঐ নিরীহ ছোকরাটির গায়ে সাহেব হাত দিলে সেজদাও আস্তিন গোটাতেন। এর ফলে এক বছরের জন্য সেজদা rusticated হন। মেজদা (যোগেশচন্দ্র) তখন বাড়ির কর্তা, দাদা তখন বিলেতে, আর বাবা বিদেশে। মেজদা আমাদের সকলকে হুকুম দিলেন কৃষ্ণনগর ফিরে যেতে। আমার কলকাতা ছাড়তে বিশেষ আপত্তি ছিল। মেজদা বললেন, ও ছোকরা বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গেছে, তাই ও কলকাতা ছাড়তে চায় না। এ কথা শুনে আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। আমি বললুম, আচ্ছা, আমি যাব। আমরা পুজোর সময়ে কৃষ্ণনগর ফিরে গেলুম। গিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি হলুম।

আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করিনি। সেই দু-জনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধ হয় ১৮৮৪ খ্রি. সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী একটি বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বললেন, 'চলো না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না-শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চলো। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ির খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে অ্যালবার্ট হলে না-গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।

এর বছর-দেড়েক পরে কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কারণ ঐ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে আমি কৃষ্ণ-নগরে প্রত্যাবর্তন করি। এবার কৃষ্ণনগর আমার বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এবং আমি স্বেচ্ছায় কলকাতা ত্যাগ করিনি বলে আমার মনও ভালো ছিল না। সময় কাটাবার জন্য আমি বাবার লাইব্রেরি থেকে নানা রকম বই পড়তে শুরু করলুম। দুখানি বইয়ের কথা আজও মনে আছে : বায়রনের Don Juan আর ল্যান্ডরের Imaginary Conversations. আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরী শিকারে মত্ত হয়ে গেলেন। বন্দুক দিয়ে পাখিমারা-শিকারি সর্বত্রই আছে। সুতরাং তাঁর সহ-শিকারিও জুটে গেল। কৃষ্ণনগরে বাঘ নেই, তা হলেও শ্রীবন নামে অঞ্জনার ধারে রাজার একটি অদ্ভুত বাড়ি ছিল; উঁচুতে পাঁচ-ছয় তলা, প্রতি তলায় একটি করে ঘর, আর চারপাশে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সেজদা তাঁর শিকারি বন্ধুদের নিয়ে বাঘের তল্লাসে ঘুরে বেড়াতেন। আর মুসলমান চাষাদের অতিথি হয়ে চালের গুঁড়োর রুটি আর তেলে রান্না মুরগির কারি খেতেন। আমি কৌতূহল-বশত একদিন এই শিকার-অভিযানে যাই, রাজার হাতিতে চড়ে। সমস্ত দিন হাতির ঝাঁকুনি ও রোদ্দুরে আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। পরদিন

আমার জ্বর হল, একেবারে ১০৫°। সেই জ্বর দিন-আষ্টেক থাকে। আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত 'বালক' পত্রিকা পড়তুম। এ পত্রিকা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এর ভাষা অতি সহজ, এবং অতি চতুর, আর রসিকতায় টগবগ করত। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। অনেকগুলি ছোটখাটো প্রবন্ধ এই কাগজে প্রকাশিত হত। আমি পরে শুনেছি সে সব রবীন্দ্রনাথের বেনামি লেখা।

জ্বর থেকে উঠে আমি বাবার কাছে দিনাজপুরে চলে যাই। এবং বৈশাখ মাস পর্যন্ত সেখানেই থাকি। গ্রীষ্মকালে দিনাজপুর ভীষণ গরম। এই গরমের জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোন কারণে হোক, আমার সেখানে ভয়ঙ্কর melancholia হয়। ইংরিজিতে যাকে বলে metaphysical troubles, আমার মনের ভিতর তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেই সময়ে আমার সেজদা দিনাজপুরে আসেন। আমি বাবাকে বললুম, 'এবার আমি ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারব না।' তিনি তাতে কোন আপত্তি করলেন না। দিনাজপুরেও আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। জ্বর নয়, হজমের গোলমাল। বাবার কাছে হলধর নামে একটি হরিপুরের চাকর থাকত। তাকে তিনি ছেলেবেলা থেকে প্রতিপালন করেছিলেন। সে ছিল যৌবনে অতি বলশালী। কিন্তু দিনাজপুর গিয়ে দেখলুম, কোন কাজ করে না। কেবল বসে-বসে গুলি খায়। আমি বাবাকে বলেছিলুম, 'একে রাখেন কীসের জন্য?' তিনি বলেন, 'বিদেশে একা থাকি, যদি কখনও অসুখ হয়, তা হলে হলধর আমার শুশ্রূষা করবে।'

আমি দেখলুম, এ কথা ঠিক। কারণ আমার অসুস্থ অবস্থায় হলধর আমার খাটের পাশে সকাল-সন্ধ্যা বসে থাকত; এবং যখন যা ফাইফরমাশ করতুম, সে কাজ করে দিত। দিনাজপুরে আমরা যে-বাসায় ছিলুম, সেটি শহর থেকে অনেক দূরে। বাবা ছিলেন Land Acquisition Collector, তাই যে-প্রকাণ্ড বাংলোটিতে আমরা ছিলুম, সেখানে তাঁর আপিসের আমলা-ফয়লা সকলে বাস করত; এবং ম্যাপ আঁকা প্রভৃতি কাজ করত। আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতুম। একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি দিনাজপুরের রাজবাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, সেকেলে রাজকায়দা সব বজায় আছে। ফটক থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত মশালধারীরা আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে নাচের আসর বসেছিল। তয়ফাওয়ালিদের দেখলুম একের পর আর-একটিকে পান দিয়ে বিদায় করা হল। পান দেওয়ার অর্থ শুনলুম, ঢের হয়েছে, এখন সরে পড়ো। এর বহু পরে ঐ দিনাজপুরের

রাজবাড়িতে আবার যাই। দিনাজপুর অঞ্চল থেকে রাজাবাহাদুর অনেক প্রস্তরমূর্তি সংগ্রহ করে তাঁর বাড়ি সাজিয়েছেন। একটি স্তম্ভ সংগ্রহ করেছেন, যার উপর একটি খোদিত লিপি আছে।

আমি দিনাজপুরে অসুস্থ অবস্থায় ডিকেন্সের Martin Chuzzlewit পড়ি। সে বইখানি আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আমেরিকানদের কথায়-কথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করার বিষয়টাই আমার কেবল মনে আছে। বাবার আপিসের হেডক্লার্ক কীর্তন গাইতেন। একটি ব্রজবুলি গানের প্রথম ছত্র আমার আজও মনে আছে—

এতেক মিনতি যব করলহ মাধব
তবু নাহি হেরিল বয়ান।

এরই বাংলা অনুবাদ করে তিনি গাইতেন। তা ছাড়া, বাবার কোন 'পলি' চাকরের মুখে কবি কালিদাসের ভাগ্নে রচিত দুটি শ্লোক শুনি যা কহতব্য নয়।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আমি ও সেজদা কৃষ্ণনগরে ফিরে আসি। দিনাজপুরের তুলনায় কৃষ্ণনগর দার্জিলিং মনে হয়েছিল। যদিচ কৃষ্ণনগরও যথেষ্ট গরম। তবে সেখানে লু বইত না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু মন প্রকৃতিস্থ হল না। দিনাজপুরের melancholia ও গ্রীষ্মের জের টেনে এনেছিলুম। আমার ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগর বোধ হয় তেমন গরম ছিল না। অন্তত আমার কাছে অসহ্য মনে হয়নি।

এবার কৃষ্ণনগরে এসে দুপুরবেলায় বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুধু কাঠ-ঠোকরার আওয়াজ শুনতুম। চাতকের 'ফটিক জল' ডাক কখনও শুনিনি। তিন বৎসর কলকাতা-বাসের পর কৃষ্ণনাগরিক গ্রীষ্ম ঈষৎ কষ্টকর হয়েছিল। তখন ইস্কুল-কলেজের গরমের ছুটি। আমাদের পিঠপিঠি মেজদাদা (যোগেশ চৌধুরী), আমার ভগ্নী মৃণালিনী এবং ভগ্নী প্রিয়ম্বদা, এঁরাও কলকাতা থেকে ছুটিতে কৃষ্ণনগর চলে এলেন। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে স্নেহ আশ বলে একটি মেয়ে ও কেশববাবুর সমাজের ভাই দীননাথের এক পুত্র এলেন। তিনি ছিলেন গাইয়ে। তাঁর গান শুনে আমরা মুগ্ধ হইনি। সে সব গানের যেমন কথা, তেমনি সুর। তার একটি গানের প্রথম লাইন আমার আজও মনে আছে, সেটি এই— 'নববিধানের কলের গাড়ি চলে যায়।' এটি বোধ হয় নববিধানের সঙ্গীত।

এই সময় আমি কালিদাস বাগচী বলে কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ি

রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে, যে-ডাক্তার পূর্বে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্য লাহিড়ীর মুখে একটি গান শুনে চমকিত হয়ে উঠি। গানটি বাংলা, যথা— 'বঁধু তুমি বলেছিলে তোমা বই আর কারও নই।' গানের সুরের নাম শুনলুম 'কানাড়া'। এমন সুন্দর গান আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। এ রাগ আজ পর্যন্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। এবং আমার বিশ্বাস যে, হিন্দু সঙ্গীতের রাগরাগিণীর ভিতর কানাড়াই হচ্ছে রাজা। সত্য লাহিড়ী ছিলেন অতি সুগায়ক। তাঁর গলা ছিল যেমন মিষ্টি, তেমনি গতে পুরু।

পূর্বে বলেছি যে, আমি ছেলেবেলায় একটি যুবকের মুখে পিলু রাগিণীর একটি গান শুনি, যেটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার বিশ্বাস সেটি আমি এই সত্য লাহিড়ীর মুখেই শুনি। তিনি ছিলেন দাদার সহপাঠী, আমার চাইতে অনেক বড়। ইতিমধ্যে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ফলে তিনি পুরো ওস্তাদ না-হলেও একরকম হাফ-ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। আমি এই সময় থেকেই তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠি। যদিচ চরিত্রবান বলে তাঁর সুনাম ছিল না।

এই গান শুনে আমার melancholia কেটে যায় ও আমি দুটি অল্প-বয়সের ছোকরা, যারা গাইতে পারে, তাদের আমাদের বাড়িতে এনে রাখি এবং তাদের ভরণপোষণের ভার নিই। এমনকী, তাদের ইস্কুলের মাইনে পর্যন্ত আমি দিতুম। এর জন্য মাস্টারমশায় কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা উভয়েই ছিল তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সতীশ বলে ছোকরাটির গলা ভারি মিষ্টি ছিল। কিন্তু সে গলা টেকসই নয়। একটু বয়স হলেই সে গলার মাধুর্য যে নষ্ট হবে, তা আমি তখনই বুঝেছিলুম।

তারা আমার ছোটভাই অমিয়র সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। বহুকাল পরে শুনেছি যে, এ দু-জন অমিয়র কাছে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যের প্রার্থী হয়ে এসেছিল। এর থেকে অনুমান করছি যে, তারা না-লেখাপড়া, না-সঙ্গীত— কোন বিষয়েই লাভ করেনি।

আমি কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে আবার ভর্তি হলুম। তখন সে কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ম্যান-সাহেব। তিনিই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। কী রকম পড়াতেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমি প্রফেসরদের কথায় বড় একটা মনোযোগ দিতুম না। অপরিচিত সহ-পাঠীদের সঙ্গে ক্লাসে গল্পসল্পও করতুম না। এক কোণে চুপচাপ করে বসে থাকতুম। নকুলেশ্বর পণ্ডিত আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যে পারদর্শী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর পঠনপাঠনের ভিতর কোন রসকষ ছিল না। অপর মাস্টার কে-কে ছিলেন আমার মনে নেই। ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও মিষ্টভাষী। কিন্তু আমি দু-চার দিনেই আবিষ্কার করলুম যে, ফিজিক্স সম্বন্ধে তাঁর চাইতে আমার জ্ঞান পরিষ্কার। সে কথা তাঁকে বলতেও আমি ত্রুটি করিনি। তিনি ছিলেন নদে জেলার কোন বিশিষ্ট জমিদার বংশের ছেলে এবং অতি সদাশয় লোক। ছোকরা বয়সে হয়েছিলেন ঘোর ব্রাহ্ম।

আমি প্রথম থেকেই প্রিন্সিপাল ম্যান-সাহেবের সুনজরে পড়ি, এবং তাঁর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠি— যার পরিচয় আমি পরে পাই। কলকাতা থেকে চলে এসে দলছাড়া হয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলুম না, তাই আমি ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না-করে পূর্বোক্ত সত্য লাহিড়ীর গানের আড্ডায় যোগ দিলুম। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রামতনু লাহিড়ীর ভাই কালী লাহিড়ী ছিলেন কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার; সত্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবার কৃষ্ণনগর ফিরে গিয়ে দেখি সত্যও হয়েছেন একজন ডাক্তার— ইস্কুল-কলেজে পড়ে নয়, তাঁর পিতার কাছে শিখে। তিনিও হয়ে উঠেছিলেন একটি খুব ভালো চিকিৎসক। তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং রোগ সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর সহায় হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর ডিস্পেন্সারিতে জনকতক যুবক গিয়ে জুটত; তাদের মধ্যে কেউ বেকার, কেউ বা গবর্নমেন্টের ছোটখাটো চাকরি করে। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন-না-কোন যন্ত্রে হাত লাগাত, যথা— সেতার, বেয়ালা, বাঁয়া তবলা, ঢোলক ইত্যাদি। একমাত্র সত্যই সব যন্ত্র বাজাতেন। এ ছাড়া কৃষ্ণনগরে শশী কর্মকার বলে একটি ওস্তাদের আবির্ভাব হয়, তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। তিনি পূর্বে কলকাতায় হ্যামিলটনের দোকানে নুলিবুলির কাজ করতেন। সেই সময়ে বিখ্যাত গায়ক নুলো গোপালের নিকট তিনি গান শেখেন। নুলো গোপালকে বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখেছি। তখন তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরত না। তিনি আমার এবং আমার খুড়শ্বশুর-মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ফিসফিস করে একটি গান গাইলেন। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলুম। কী মিষ্টি তাঁর তার। কী দরদি তার মিড়। আর বুঝলুম যে এঁর যখন গলা ছিল, তখন ইনি একটি অসাধারণ গাইয়ে ছিলেন। শশী কর্মকার এ হেন ওস্তাদের কাছে শিক্ষা পেয়ে যে একটি ভাল গাইয়ে হয়ে উঠেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি হিন্দুস্থানি

ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের গান অতি চমৎকার গাইতেন। এর পূর্বে কৃষ্ণনগরে বদ্রি সুকুল নামে একটি হিন্দুস্থানি ওস্তাদ ছিলেন। তিনি নাবালক রাজাকে সেতার এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সত্য লাহিড়ী প্রথম-প্রথম সেই বদ্রি সুকুলের কাছে সেতার ও গান শেখেন।

এঁদের দলে মিশে আমার সঙ্গীতের নেশা হয়। সে নেশা এখনও সম্পূর্ণ ছোটেনি।

এ অবস্থায় এবার কৃষ্ণনগরে আমি যে বিশেষ কিছু লেখাপড়া করতুম, তা নয়। এমনকী নতুন পাঠ্যপুস্তকও আমি কিনিনি। কলেজ খোলা থাকলে দশটায় সেখানে একবার যেতুম, আর চারটের পর ফিরে আসতুম। তার পর পাঁচটা আন্দাজ সত্য লাহিড়ীর ডিস্পেন্সারিতে যেতুম, এবং ঘণ্টাখানেক সেখানে হয় গান-বাজনা শুনে, নয় গল্পসল্প করে সাড়ে-সাতটার পর বাড়ি চলে আসতুম। এই বাড়ি ফেরার পথটা একটু অদ্ভুত ছিল। রাস্তায় জনমানব কখনও দেখিনি, আর দু-পাশে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সেগুন গাছ ছিল, তাই অন্ধকারের ভিতর সেই পথ দিয়ে ফিরতে হত। একদিন পথে ভূতের ভয় পাই। সেই নির্জন রাস্তায় হঠাৎ সেই সেগুন গাছের তলা থেকে একটি বিকট হাসির আওয়াজ পেলুম। মনে করলুম, এ হাসি কোন মানুষের হাসি কি না, সেটা না-জেনে ভয়ে আর অগ্রসর হতে পারব না। তাই প্রতি সেগুন গাছের গায়ে ছড়ি দিয়ে মারতে-মারতে দু-চার পা করে এগোতে লাগলুম। হঠাৎ একটি মহা চিৎকার শুনলুম। আমি একটু এগিয়ে দেখি একটি গাছের তলায় এক পাগলি দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার পূর্বপরিচিতা। তখন আমার ভয় কেটে গেল। এ ছাড়া মধ্যে-মধ্যে রাস্তার ধারে যেখানে বড় গাছ কম, সেখানে ছোট গাছে শাঁখচুন্নি দেখেছি। প্রথম শাঁখচুন্নি দেখি, একটি শেওড়া গাছের ডালে পা দিয়ে সাদা কাপড়-পরা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। সে বারও আমি ছড়ি দিয়ে সেই স্ত্রীলোককে আঘাত করি। তাতে আবিষ্কার করি যে, গাছের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে এই শাঁখচুন্নির রূপ ধারণ করেছে।

সত্যবাবুর ডিস্পেন্সারি থেকে আমাদের বাড়ি প্রায় আড়াই মাইল দূরে, আর এর বেশির ভাগ পথ সেগুন গাছের বীথির ভিতর দিয়ে যেতে-আসতে হত, সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। তবু সঙ্গীত অথবা আড্ডার এমনি নেশা যে, আমার উক্ত আড্ডায় হাজির হওয়া নিত্যকর্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল।

আমার কলেজের পড়াশুনায় মন ছিল না। শেষটা ডিসেম্বর মাসে

আমি পরীক্ষার পড়া পড়তে আরম্ভ করি ও ফেব্রুয়ারি মাসে টেস্ট পরীক্ষা দিই। তার ফল থেকে আমি অনুমান করেছিলুম যে, আমি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হব। তার কিছুদিন পরেই ৩ মার্চ ১৮৮৬ সালে আমার দাদা আশু চৌধুরী পাঁচ বৎসর পর বিলেত থেকে ফিরে এলেন। সেই দিনই আমার পায়ে অল্প-অল্প ব্যথা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভাগমে বাড়িতে মহা হৈচৈ পড়ে গেল। সুতরাং আমার পায়ের ব্যথার কোন তদ্বির করা হল না। দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সে ব্যথা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল; এবং জ্বর উঠল ১০৫°। শুনলুম আমার যা হয়েছে তার নাম নাকি rheumatic fever. আমি একুশ দিন অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে রইলুম। একুশ দিনের পর আমার জ্বর ছাড়ল এবং ব্যথা কমতে আরম্ভ করল। সে বৎসর তাই আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না।

রোগমুক্ত হবার কিছুদিন পর আমি আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন লাভ করি। দাদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাত্রা করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কৃষ্ণনগরে আসেন। প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথ আমার মনে কী রকম গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন, সে কথা আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বলেছি। এ স্থলে তার পুনরাবৃত্তি করব না। সে সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখি ও তাঁর কথাবার্তা এবং গান শুনি। আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে দক্ষিণে একটি লম্বা-চওড়া ঢাকা বারান্দা ছিল এবং তার দক্ষিণে একটি মাঝারি গোছের খোলা বারান্দা ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে দাদা ও রবীন্দ্রনাথ বসে তাল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে আসবার কিছু পূর্বে কলকাতায়, বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজে, তাল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। আমি ঢাকা বারান্দায় অন্ধকারের ভিতর বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলুম। শুনে দাদাকে একটি প্রশ্ন করলুম। সেই রাত্রে দাদার মুখে শুনি যে, আমার প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ প্রশ্ন কে করলে?' দাদা বলেন, 'আমার একটি ছোট ভাই।' রবীন্দ্রনাথ নাকি দাদাকে বলেন, 'তোমার ও-ভাইটি দেখছি অতি বুদ্ধিমান ও চতুর।' আমার সে প্রশ্নটি ছিল এই যে— রাস্তা দিয়ে একটি ঘোড়া যদি সমান জোরে দৌড়ে যায়, তবে তার সমপদ-বিক্ষেপের শব্দ কি কানে মিষ্টি লাগে না? যদিচ তার ভিতর কোন সুরস্বর নেই, আছে শুধু সমান সময় ব্যবধান। তিনি কৃষ্ণনগরের মতো

পাড়াগাঁয়ে এসে, একটি রুগ্‌ণ ছোকরার মুখে এরকম প্রশ্ন বোধ হয় প্রত্যাশা করেননি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।

এর মাসখানেক পরে আমি দাদার সঙ্গে আবার কলকাতায় পড়তে ফিরে আসি। সেকালে একবার পরীক্ষা না-দিলে কলেজে মাত্র ছ-মাস পড়তে হত। আমি মট্‌স লেনে একটি বাসায় থাকতুম। কিন্তু কলেজে যেতুম না। ছ-মাসের জন্যে St. Xavier's College-এ ভর্তি হই! তখন তার কলেজ ক্লাস হত লালবাজারের একটি বাড়িতে। তার মালির ঘর অর্থাৎ জলখাবার ঘরে দস্তুরমতো আড্ডা বসত। ছাত্রদের ভিতর কেউ-কেউ বাইরে থেকে বিয়ার আনিয়ে পান করত।

এই সময়ে আমার সঙ্গে নতুন কতকগুলি ছাত্রের পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ বুদ্ধিমান ছোকরা ছিল। যথা— সতীশ মুখুজ্যে ও তুলসী মুখুজ্যে। সতীশ বার্মায় গিয়ে ম্যান্ডালেতে বড় উকিল হন; কিন্তু অল্প-বয়সেই মদ খেয়ে মারা যান। আর তুলসী পাঠ্যপুস্তক লিখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইংরিজি ভাষা তিনি ভালোই জানতেন। তিনিও শুনেছি সুরার কবলে প্রাণত্যাগ করেন। যারা স্কুল-কলেজে পড়ে না, এমন কোন-কোন ছোকরাও সেখানে আড্ডা দিতে আসত। কিন্তু তারা মদ্যপান করত না। তাদের মধ্যে একটি সোনার বেনে ছেলেকে দেখেছি, যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এবং তাঁর মুখেই শুনেছি, যে-সব স্ত্রীলোক সমাজ-বহির্ভূত— তিনি তাদের সেই কবিতা পড়ে শোনাতেন ও মুখস্থ করাতেন।

আমি St. Xavier's থেকে এফএ দিই ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

আমি যে এবার পরীক্ষায় এক ধাপ নেবে যাই, তার কারণ দু-দুবার রোগাক্রান্ত হয়ে আমি পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলুম। ইস্কুলের লেখাপড়ায় আমার মন লাগত না। তা ছাড়া rheumatic fever-এর প্রসাদে আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবুরা ভয় দেখিয়েছিলেন যে, উক্ত রোগে যদি আমার হৃদ্‌যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। এবং আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আমি যেন কোন রকম exercise না-করি। আমি এর পূর্বে ফুটবল খেলতুম। আমি এবং আমার ভাই মন্মথ বোধ হয় প্রথম বাঙালি ছেলে যারা ফুটবলে পদাঘাত করে। মন্মথ অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন সাহেবের কাছে ফুটবল খেলা শিখেছিল। মন্মথর ছিল শরীরের গড়ন

চমৎকার ও বলিষ্ঠ। ভয়ডর কাকে বলে সে জানত না। আমার বন্ধু নারায়ণ শীলের কাকা হরিদাস শীল একদিন আমাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, এসো আমরা সকলে মিলে ফুটবল খেলা শুরু করি। এবং তিনি নিজের ব্যয়ে একটি ফুটবল কিনে আমাদের দেন। মন্মথ ফুটবল খেলার নিয়মকানুন সব জানত। সে-ই আমাদের ফুটবল খেলা শেখায়। মন্মথ আর আমি, আমরা দুটি পাড়াগাঁয়ে ছেলে forward খেলতুম। ধাক্কাধুক্কি খাওয়ায় আমরা ভয় পেতুম না। আমি কস্মিনকালে কোন খেলাতে ভালো ছিলুম না। কিন্তু আমার এই ফুটবল খেলার নেশা হয়। ক্রমে-ক্রমে আরও পাঁচজন ছেলে ফুটবল খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। লালচাঁদ বড়ালও এই খেলোয়াড়দের ভিতর একজন ছিল। এদের ভিতর একটি ছোকরাকে আমি বহুকাল পরে দেখি। তখন তিনি সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। আর তাঁর প্রায় পেন্সন নেবার বয়স হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে শিবপুরে একটি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অল্প-বয়সের এই শখ চিরজীবনের প্রধান শখ হয়ে উঠেছিল। আমাদের ভিতর অবশ্য আমার ভাই মন্মথ পয়লা নম্বরের ফুটবল-খেলিয়ে হয়ে ওঠেন। গোরাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে গিয়ে তাঁর একটি পা জখম হয়।

আমি এই অসুখের পর ফুটবল খেলা ছেড়ে দিলুম। খেলাধুলো করিনে, ইস্কুল-কলেজের বইও পড়িনে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে দিনযাপন করা কষ্টকর হয়ে উঠল। দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসি বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ করে বসে থাকো, ফরাসি শেখো না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।' সেই থেকে আমার ফরাসি বই পড়ার অভ্যাস হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে-সব নতুন লেখকের বই নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে কখনও তাদের নাম শুনিনি— যথা, রসেটি ও সুইনবার্ন প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দাদার বাড়ির আবহাওয়া aesthetic ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যহই আমাদের মট্‌স লেনের বাসায় শুভাগমন করতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী। আমার যত দূর মনে পড়ে সত্যপ্রসাদ হার-মনিয়ামে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গত করতেন। তিনি মধ্যে-মধ্যে অভিজ্ঞা নামে একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এমন চমৎকার গাইয়ে মেয়ে আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তার গলা ছিল সুমিষ্ট ও

দরদি, আর সে অভিনয় করত অতি সুন্দর। আমি তাকে বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম গান থেকে আরম্ভ করে শেষ গান পর্যন্ত অবলীলাক্রমে এককালীন বসে গাইতে শুনেছি। বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য। তার গানের রূপ ফুটিয়ে তুলতে অভিনয়ের আবশ্যক। ও-নাটকের সমস্ত গান গাওয়াই অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাতে দেশি-বিলেতি নানা রূপ সুর আছে, দেশি গান ভারি-ভারি রাগেরও আছে, এবং দেশি-বিলেতি প্রত্যেক সুর বিভিন্ন রকম অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে। বাল্মীকি প্রতিভার গান অভিজ্ঞার মতো মর্মস্পর্শী করে গাইতে আমি আর কাউকে কখনও শুনিনি। সঙ্গীতের বিষয়ে তার কিছু শিক্ষাও ছিল; সে কোন-কোন হিন্দি গানও অতি দরদ দিয়ে গাইত! 'ঠারি রহো মেরে আঁখন আগে' বলে অভিজ্ঞার গীত একটি ছায়ানটের গান আজও আমার কানে লেগে আছে। অভির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন তার বয়স বছর-তেরো হবে। দেহ বলে তার কোন জিনিস ছিল না। মুখের মধ্যে দুটি বড়-বড় জীবন্ত চোখ ছিল। আর সে চোখদুটি মাধুর্যপূর্ণ। সে ছিল শেক্সপিয়রের কল্পিত আরিয়েলের সগোত্র। অর্থাৎ অশরীরী সঙ্গীত। সে মেয়েটি বিবাহিত হবার জন্য জন্ম-গ্রহণ করেনি। অবশ্য পরে তার বিবাহ হয়েছিল, আমার বিলেতে পরিচিত কোন যুবকের সঙ্গে। আমি শুনেছি যে, বিবাহের এক মাসের মধ্যেই সে ক্ষয়কাশে মারা যায়। এ খবর যখন পাই, তখন আমি বিলেতে ছিলুম। শুনে আমার মনে হল, বাংলা দেশের একটি রত্নপ্রদীপ অকালে নিভে গেল। আমি অভিজ্ঞার বিষয়ে এত কথা লিখছি এই কারণে যে, জীবনে কোন-কোন লোক প্রথম থেকেই আমাদের মনে বিশেষ ছাপ রেখে যায়, যা কখনও বিলুপ্ত হয় না। অভি ছিল সেই দু-চারটি লোকের ভিতর একজন। ইংরেজরা বলে, Whom the gods love die young. অভি ছিল সেই দেবানাং প্রিয় একটি বালিকা। কেননা, সে কখনও কিশোরী হয়নি। এরই বড়দিদি প্রতিভা দেবীকে আমার দাদা বিবাহ করেন।

সেকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল একটি সঙ্গীতভবন। রবীন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতিতে পড়েছি যে, এককালে তাঁদের বাড়িতে বড়-বড় সব ওস্তাদ অধিষ্ঠান করতেন, যেমন যদু ভট্ট। কিন্তু আমি তাঁদের দেখিনি। আমার যখন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন বিষ্ণু নামক একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ প্রতিভা দেবীদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমার ধারণা, তিনি খুব ভালো গাইতেন। তাঁর গানে তানের বাহুল্য ছিল না। অথচ রাগরাগিণী, সুর ও তালের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। আমি পূর্বে

যে হিন্দি গানটির উল্লেখ করেছি, সেটি বিষ্ণুর গান। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের স্বরচিত গান বাড়ির অনেক ছেলেমেয়ে গাইত। এবং মন্দ গাইত না। দিনেন্দ্রনাথ তখন বালক ছিলেন। তিনি যে পরে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সে এই আবহাওয়ার গুণে। রবীন্দ্রনাথকে আমি কখনও কোন যন্ত্র বাজাতে দেখিনি। তিনি চর্চা করেছিলেন একমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত। আমরা অবশ্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতুম না, থাকতুম মট্‌স লেনে একটি ছোট বাসাবাড়িতে। কিন্তু দাদার বিবাহ-সম্বন্ধ হবার পর থেকে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হয়। এর একটি কারণ বোধ হয় আমরা ব্রাহ্ম না-হলেও reformed Hindus ছিলুম। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধ আমরা উপেক্ষা করতুম। এবং আমরা ভাইরা সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত ছিলুম।

এই ঘনিষ্ঠতার ফলে ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক সঙ্গীতচর্চার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত ছিলুম না। তাঁদের সঙ্গীতের দুটি ধারা— একটি ক্ল্যাসিকাল আর একটি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়— দুটিই পাশাপাশি চলত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যে মার্গসঙ্গীতের প্রকৃষ্ট চর্চা করতেন, তার প্রমাণ আদি ব্রাহ্মসমাজের আদি ব্রহ্মসঙ্গীতে পাওয়া যায়। আমি ছেলেবেলা থেকে এর কতকগুলি গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম। সে গানগুলি বাংলা দেশের গাইয়ে-বাজিয়েদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল— যথা, গাও হে তাঁহার নাম, খাম্বাজ-চৌতাল; অচল ঘন গহন, বাহার-চৌতাল; দেখিলে তোমার সেই, বাহার-একতালা; তুমি হে ভরসা মম, কাফি-ঝাঁপতাল ইত্যাদি। হয়তো পূর্বে এ কথার আমি উল্লেখ করেছি, কিন্তু তার পুনরুক্তি করায় ক্ষতি নেই। হিন্দি গান বাংলায় প্রথম এঁরাই ভাঙেন। পরে শুনেছি 'গাও হে' এবং 'দেখিলে তোমার' গান দুটি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'অচল ঘন' বিষ্ণু ওস্তাদের, এবং 'তুমি হে ভরসা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। আমি এ সব গানের তালের উল্লেখ করেছি। যদিচ আমি তালের কোন ধার ধারিনে। তবে চৌতাল শুনলে বুঝতে পারি যে তার বোল 'ভেটকি মাছের তিনখানা কাঁটা' নয়।

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের গান অধিকাংশই পিলু বারোয়াঁ জাতের ছিল, এবং তার তাল ছিল বিলম্বিত নয়— নাচুনে। আমার কান বাঙালির স্বকৃতভঙ্গ মার্গসঙ্গীতে অভ্যস্ত ছিল, যাতে সুরের রূপ বজায় থাকত, তান-কর্তবে ঢাকা পড়ত না। তাই কৃষ্ণনগরের মহারাজার সেতার-শিক্ষক বদ্রি সুকুলকে খুঁজে বার করলুম। তিনি শ্যাম ক্ষেত্রী নামক একটি

যুবকের সঙ্গে রূপচাঁদ রায় স্ট্রিটে বাস করতেন। উভয়েই ডন, মুগুর ও কুস্তি করতেন, আর অবসরমতো সেতার বাজাতেন। সেকালে সঙ্গীত আমাকে বিশেষ রকম বিচলিত করত। আমাদের বাসায় একদিন সকাল-বেলা বদ্রি সুকুল ভৈরবী বাজান, তা শুনে আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। এই সুকুলজি পরে ঠাকুর পরিবারের কোন-কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গীতশিক্ষক হন। তিনি ছিলেন ঘোর হিন্দু, পয়লা নম্বরের পালোয়ান এবং অতি সচ্চরিত্র। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, আমার কৃষ্ণনাগরিক সঙ্গীতপ্রীতির মায়া একেবারে কাটেনি। সে যা-ই হোক, ঠাকুর পরিবারের aesthetic আবহাওয়া নিশ্চয়ই অলক্ষিতে আমার সঙ্গীতচর্চার কান্তি পুষ্ট করেছিল। অপর পক্ষে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র আমি খুব তারিফ করেছি। ও-নাটিকার কথা, সুর ও অভিনয় সবই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাপ্রসূত। এবং শ্রীমতী অভিজ্ঞা ছিল ললিতকলায় তাঁর অগ্রগণ্য শিষ্যা। পূর্বেই বলেছি যে, রূপজ্ঞানে আমি বর্জিত ছিলুম না। যে-রূপ চোখে দেখা যায় সে রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম। এবং এই ঠাকুর পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি। যে-রূপ শ্রোত্ররসায়ন, সে রূপেরও এঁরা সম্যক চর্চা করতেন। বাকি থাকল এক কাব্যের কথা। সে কথা পরে বলব।

পূর্বে বলেছি আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেই বই-পড়িয়ে লোক ছিলেন। বাবা সেকালের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত। সংস্কৃত তিনি এক বর্ণও জানতেন না ও বাংলা সাহিত্যকে তিনি একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও সকলেই ইংরেজিনবিশ ছিলেন। আমি ছেলেবেলায় তাঁদের যে-কথোপকথন শুনেছি, তার থেকে আমার ধারণা তাঁরা সকলেই বায়রনের ভক্ত ছিলেন। আর শেক্সপিয়র তাঁরা সকলেই জানতেন। বায়রন যে তাঁদের এত প্রিয় ছিল, তার কারণ তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন বাংলা দেশের ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর patriotism-এর জোয়ার বইতে আরম্ভ করেছে। তাঁরা পলিটিক্সের কোন ধার ধারতেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ যে পরাধীন, এ অবস্থা তাঁদের মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। আর আমাদের ছোট ছেলেদেরও—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়—

রঙ্গলালের কবিতার এই ছত্রটি মুখস্থ করতে হত। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, আমরা যাকে কাব্য বলি, তা শুধু শেক্সপিয়রেই পাওয়া যায়। আমার যখন সাত-আট বৎসর বয়স, তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মহাভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তাঁদের মুখে মিলের নাম শুনতুম। অবশ্য তাঁরা মিলের Logic Economics কেউ পড়েননি। তাঁরা পড়তেন শুধু Three Essays on Religion আর Subjection of Women. এমার্সনের নামও তাঁদের মুখে শুনেছি। আমি অল্পবয়সে এই মিল ও এমার্সনের নাম শুনে-শুনে তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম। তার পরে অদ্যাবধি আমি এ দুই লেখকের একখানি বইও পড়িনি। দাদারা নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' ও বঙ্কিমের প্রথম যুগের নভেল সব পড়তেন। আজও আমার বেশ মনে আছে যে আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি তখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনি। রবীন্দ্রনাথ তখন 'জ্ঞানাঙ্কুর' কি ঐরকম একটা কাগজে কবিতা প্রকাশ করতেন। এবং রবি ঠাকুর কবি কি না, দাদা ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সে বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছি।

তারপর রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য আমরা দেখিওনি, পড়িওনি। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন আমি হেয়ার স্কুলের কোন সহপাঠীর অনুরোধে 'ভগ্নহৃদয়' একটু পড়ি। পড়ে যে খুব উল্লসিত হয়ে উঠি, তা বলতে পারিনে। সত্য কথা বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই আমি তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মট্‌স লেনের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন দাদার সঙ্গে তাঁর 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশের পরামর্শ করতে। দাদাই ঐ কবিতা পুস্তক প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন। বইটি ছাপা হবার পূর্বে তিনি কবিতাগুলি দাদাকে পড়ে শোনাতেন, সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম। কবিতা বস্তুটি কী, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম। তার থেকেই আমার ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে, যা হেম-নবীনের ছিল না। এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কী বলেছেন, তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবত আমি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি।

এই সময়ে আমি একটি নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হই। দাদার

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত বিলেত থেকে ফিরে আসেন। এঁরা সকলেই বিলেতে দাদার সমসাময়িক ছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে আমি প্রথম দেখি কৃষ্ণনগরে। রাজবাড়ির পূর্ব দিকে সুকুলপাড়া নামে একটি পাড়া আছে, সেখানে সব হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণের বাস— যারা একরকম বাঙালি হয়ে গেছে। আমি দাদার সঙ্গে পরেশ সুকুল বলে একটি ভদ্রলোকের বাড়ি যাই, এবং সেখানেই প্রথম ব্যোমকেশকে দেখি। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেঠতুতো ভাই রাজেশ্বরবাবুর কন্যা মোহিতকে বিবাহ করেন। তাকে দেখে আমি একটু চমকে যাই। অতি সুন্দর পুরুষ, নাক-চোখ-মুখ সব কুঁদে কাটা, আর কথাবার্তায়, ফুর্তিতে টগবগ করছেন। যদিচ তিনি আমাদের স্বজাত, তবু প্রথম-প্রথম তাঁর সঙ্গে তেমন মেলামেশা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে তিনি আমাদের পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আমাদের বাসায় মধ্যে-মধ্যে আসতেন। এবং সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলুম। তিনি ছিলেন অতিশয় অমায়িক লোক এবং যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি নিজ গুণে কলিকাতা হাইকোর্টে সব চাইতে বড় ব্যারিস্টার হয়ে ওঠেন, এবং শেষে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ফরাসি ভাষা ভালোই জানতেন এবং অসংখ্য ফরাসি নভেল পড়তেন। সুতরাং সাহিত্যরসে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না।

লোকেন পালিত ছিলেন I C S, আর দিবারাত্রি সাহিত্যালোচনা করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মুখে খই ফুটত। আমি অবশ্য তাঁর বই-পড়া মতামত সব সময়ে গ্রাহ্য করতে পারতুম না। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। তিনি স্বনামধন্য ব্যারিস্টার টি পালিতের পুত্র। পালিত পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বহু কালের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলেত যান, তখন ছোকরা লোকেন পালিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন যে, লোকেন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কইয়ে-বলিয়ে ছোকরা।

এই নব-বিলাতফেরতের দল সকলেই ছিলেন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক। ব্যোমকেশ ছিলেন বিজ্ঞানে শিক্ষিত। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন আইনে অসাধারণ পারদর্শী। লোকেন পালিত ছিলেন সাহিত্যে অভিজ্ঞ। আমি এর পূর্বে সেকালের জনকতক বিলেতফেরতকে চিনতুম, যথা : ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, তাঁর ভ্রাতা লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ

বাঁড়ুজ্যে ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। কিন্তু তাঁরা ছিলেন আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। এই নতুন বিলেতফেরত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যেমন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তার পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তেমন হয়নি। যদিচ তাঁরা সকলেই আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন।

এঁদের দলে পড়ে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রায় কিছু-কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল; যথা টেবিলে ছুরিকাঁটায় খাওয়া, মুসলমান বাবুর্চি রাখা ইত্যাদি। আমরা সব ভাই-ই হয়ে উঠেছিলুম প্রায় আধা-বিলেতফেরত, যদিচ আমরা বিলাতি পোশাক পরতুম না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যেমন reformed Hindus ছিলুম, তেমনি reformed স্বদেশি হয়ে উঠেছিলুম। অর্থাৎ হিঁদুয়ানি ও স্বদেশভক্তির ভিতের উপর আমাদের মনের চরিত্র গড়ে উঠেছিল।

এখানে একটি গল্প বলি। আমি যেদিন সন্ধ্যায় লন্ডনে গিয়ে পৌঁছই, তার পরের দিনই Inner Temple-এ ভর্তি হই, আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই সেখানে dinner খেতে যাই। Temple-এ এক-এক term-এর ভিতর অন্তত দু-দিন dinner না-খেলে সে term রক্ষা করা হয় না। আমি গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড খানা-কামরা লোকে ভর্তি। একটি টেবিলে এক বাঙালি ছোকরা বসেছিলেন, তাঁর পাশের চেয়ার খালি দেখে আমি সেই চেয়ারে বসে পড়লুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— আপনি বাঙালি?

— হাঁ।

— বিলেতে এলেন কবে?

— গতকল্য।

— আমি আপনাকে ছুরিকাঁটা ব্যবহার করতে শেখাই।

— আচ্ছা।

এর পর তিনি আমাকে শেখাতে লাগলেন যে ডান হাতে ধরতে হয় ছুরি, আর বাঁ হাতে কাঁটা। আর কোন্ কাঁটা-ছুরিতে মাছ খেতে হয়, তা-ও দেখালেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে প্রথমে যখন সুরুয়া এল, ভিতরে খোঁদল-করা প্লেটে, তখন তিনি সে প্লেটটি বুকের দিকে হেলিয়ে চামচ দিয়ে সুপ তুলে খেতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললুম— 'এ প্লেটটি উলটোদিকে হেলাতে হয়।' তিনি বললেন— 'আপনি আমাকে শেখাতে এসেছেন?' তখন আমি বললুম— 'তাকিয়ে দেখুন, ইংরেজরা কী রকম করে সুপ খাচ্ছে।' একনজর দেখে, হাতের চামচ রেখে দিয়ে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। এই ছোকরাটির নাম নলিনী

বাঁড়ুজ্যে, আরার বড় উকিল কৈলাসবাবুর ছেলে। বাঙালি, কিন্তু বেহারি বাঙালি। নলিনী ছিলেন সুদর্শন আর অসাধারণ বলিষ্ঠ। পরে তিনি আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।

এ ঘটনা উল্লেখ করবার কারণ এইটে দেখানো যে, আমি বিলেত যাবার পূর্বেই ইংরিজি খানাপিনায় অভ্যস্ত ছিলুম। আমি যে তখন পলিটিক্সে ঘোর স্বদেশি ছিলুম তার প্রমাণ উক্ত টেবিলে আমার অন্য পার্শ্বে একটি ধনী পার্শি যুবক বসেছিলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'তুমি কি একজন কংগ্রেসওয়ালা?' উত্তর— 'হাঁ।'

এ কথা শুনেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন। এবং তিনি ভারতবর্ষীয় কি না জিজ্ঞেস করায় বললেন— না, তিনি পার্শি অর্থাৎ পার্শিয়ান, এবং পার্শিয়ান বলেই ইংরেজদের কাছে তাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তাঁদের ভলন্টিয়র দলে ভর্তি করা হয়, যা অন্য কোন ভারত-বর্ষীয়কে করা হয় না। আমি বললুম— 'ইংরেজরা গ্রিক সাহিত্য পড়ে, এবং গ্রিক ইতিহাস থেকেই তারা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী জানতে পেরেছে। ম্যারাথন ও থার্মপিলিতে তোমাদের বীরত্বের কথা কোন্ শিক্ষিত ইংরেজ না-জানে?'

আমাদের কথা শুনে চারপাশ থেকে ইরেজ ছোকরারা হো-হো করে হেসে উঠল। এর পরে সেই কংগ্রেস-বিরোধী যুবক মৌন অবলম্বন করলেন।

উক্ত কথোপকথনেই প্রমাণ যে, আমি আহারাদি বিষয়ে নকল ইংরেজ হলেও মনোভাবে খাঁটি স্বদেশি বাঙালি ছিলুম। আমাকে পরে কোন-কোন সাহিত্য-সমালোচক বিলেতফেরত বলে খোঁটা দিয়েছেন। এ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। পদ্যলেখক আমি সরস্বতীর মাথায় বনেট পরিয়েছি, আর গদ্য-লেখক হিসাবে আমার লেখার মাথায় হ্যাট পরিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ তখন বোধ হয় চার-পাঁচখানি মাত্র কবিতাপুস্তক লিখেছিলেন, যথা ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী, আর ছবি ও গান। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি কবি হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এমন-কী, তিনি কবি কি না তা সমালোচকেরা আলোচনা করতেন। তাঁর অভক্ত সমালোচকেরা তাঁকে বলত 'কী-জানি-কী'র কবি। অপর পক্ষে জনকতক ভক্ত তাঁর চারপাশে জুটেছিল; তাঁদের ভিতর একজন, তাঁর নাম বোধ হয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'রবিচ্ছায়া' বলে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যা রবীন্দ্রনাথের পদ্যসংগ্রহ। এই ভদ্রলোককে আমি মট্স লেনের বাসায় প্রথম

দেখি। তিনি দাদার সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করতে আসতেন। তার পর বহুকাল তিনি অদৃশ্য হন। পরে তিনি যখন Board of Revenue-র সেক্রেটারি হন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমভিব্যাহারে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেখলুম, গবর্নমেন্টের বড় চাকুরে হয়েও তাঁর রবি-ভক্তি সমান বজায় আছে।

অক্রুর দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরি বলে একটি সাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সেকালের সাহিত্যিকেরা, যথা চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি, মধ্যে-মধ্যে বক্তৃতা করতে আসতেন। অক্রুর দত্তের বাড়ির একটি যুবক আমাদের বাসায় দু-একদিন এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে সে সভায় বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ করতে। তিনি যে সাহিত্য বিষয়ে কিছু জানতেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। আমার ধারণা, তিনি হেয়ার স্কুলে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের অপর দু-চারজন বন্ধু ছিলেন, যথা প্রবোধ ঘোষ ইত্যাদি। তাঁরা অবশ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এঁদের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার নেই। তারপর রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যরসিক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কথা পরে বলব।

আমার মনের চরিত্র কী করে আস্তে-আস্তে গড়ে উঠল, সে কথা আমি পূর্বে বলেছি। আমি এফ এ পাস করবার পর কলেজ ত্যাগ করিনি। থার্ড ইয়ার ক্লাসটা আমি সেন্ট জেবিয়ার্সেই পড়ি। তখন কলেজ পার্ক স্ট্রিটে উঠে গেছে। Father Moulmein নামক একটি যুবক পাদরি আমাদের ফিলজফি পড়াতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অতি পরিষ্কার। তাঁর তুল্য সাইকোলজি পড়াতে আর কোন অধ্যাপক পারতেন না। সেই সময় থেকেই ফিলজফিতে আমার প্রীতি জন্মায়। তারপর ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে প্রেসিডেন্সিতে ফিরে যাই। এবং বি এ পরীক্ষায় ফিলজফি অনার্সে আমি ফার্স্ট হই। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিলজফির অধ্যাপক পি কে রায় আমাকে বলেন— 'তুমি যে ফিলজফি সব ছাত্রের চেয়ে বেশি জানো তা নয়; কিন্তু তোমার কাগজ যারা পরীক্ষা করেছে, সেই ইংরেজ অধ্যাপকেরা আমাকে বলেছে যে তোমার মতো অপর কেউ অত সুন্দর ও পরিষ্কার করে লিখতে পারে না।' অর্থাৎ আমি ফিলজফিতে ফার্স্ট হই আমার ইংরেজি লেখার গুণে। তারপর আমি প্রেসিডেন্সিতে এম এ পড়ি। এবং ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান আধিকার করি। এ-ও আমার বিশ্বাস

ইংরেজি রচনার প্রসাদে। আমি শেক্সপিয়রের সমালোচনা অন্য কোন সমালোচকের বইয়ে পড়িনি। আমার নিজের মতামত নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলুম, যা ইংরেজদের কাছেও গ্রাহ্য হত। এই দুই পরীক্ষাই তা প্রমাণ করে।

ইতিপূর্বে আমি বাংলা কখনও লিখিনি। আমি যখন এম এ পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তার প্রধান বক্তব্য এই ছিল যে, জয়দেব উঁচু দরের কবি নন। আমার এ মত শুনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হন। কবি অক্ষয় বড়াল সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'এত কাল পর বাংলায় একটি নতুন লেখকের আবির্ভাব হল।' সে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি উক্ত প্রবন্ধের অনেকাংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপান। সেই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমার ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে রাখি। এবং বহুকাল পরে সেটি 'সবুজ পত্রে' পুনঃপ্রকাশিত করি। এর কারণ সেটি আবার পড়ে দেখলুম যে আমি আমার মত পরিবর্তন করিনি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্তমান।

এর পর থেকেই আমি বাংলা লেখক হয়ে উঠলুম। আমার বি এ ও এম এ পরীক্ষার ফল শুনে রবীন্দ্রনাথ মহা খুশি হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছে, এটি তাঁর পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমি যখন এম এ দিই, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য বিলেত গিয়েছিলেন; যার বিবরণ তাঁর য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রিতে পাওয়া যায়। তিনি বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমার এম এ পরীক্ষার ফল বোধ হয় প্রকাশিত হয়।

এর পর সুরেশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় Prosper Merimée-র 'Etruscan Vase' নামক একটি গল্প তর্জমা করে 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় আমাকে আক্রমণ করেন। দুটি কারণে, প্রথমত 'ফুলদানি'র মতো গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে, দ্বিতীয়ত পাকা ফরাসি লেখকের লেখা কাঁচা বাংলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য

করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা মানিনি। আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ রকম সমালোচনা আশা করিনি। তার পরেই আমি মেরিমে-র 'কার্মেন' তর্জমা করি। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করিনি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়-বস্তু 'ফুলদানি'র চাইতে ঢের বেশি অ-সামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজ্‌মকে আমি কোন কালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।

এম এ পাশ করবার পর আমি প্রায় দু-বৎসর বেকার বসেছিলাম। কিছু দিন পর আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে State Scholarship নেব কি না, তাই জানবার জন্য একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের দু-এক মাস বেশি। এ কথা লেখার দরুন রেজিস্ট্রার ম্যান-সাহেব আমার উপর বিরক্ত হন। আমি তাঁর অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এর পর বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি নিতে রাজি কি না জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রাজি হইনি। তার কিছুদিন পর তিনি আমাকে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন; তার বেতন মাসিক পাঁচশ টাকা। দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেড়াপিড়ি করেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। বাবা তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দাদা তাঁকে এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ চাকরি নিতে আপত্তি কী?' আমি বললুম, 'পরের চাকরি করতে আমার মন সরে না।' বাবা বললেন, 'প্রমথ যখন বিবাহ করেনি, তখন তার অনিচ্ছায় আমি তাকে পরের চাকরি নিতে বাধ্য করতে চাইনে।' তাই ম্যান-সাহেবের এ প্রস্তাবও আমি অগ্রাহ্য করলুম।

কলেজ থেকে বেরিয়েই পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি কেন যে আমি প্রত্যাখ্যান করলুম, তা বলতে পারিনে। সম্ভবত কর্মবিমুখতাই এর প্রকৃত কারণ। তারপর আমি জনৈক প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি আশুতোষ ধরের আপিসে articled clerk হই। এবং বিলেত যাওয়া পর্যন্ত নামমাত্র সে আপিসেই কাজ করি।

প্রথম থেকেই আমি অ্যাটর্নি আপিসের চেহারা দেখে ভড়কে যাই। এত ধুলো, আর র‍্যাকের উপর এত মোটা-মোটা ও এত জীর্ণ খাতা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। আইন হয়তো বই পড়ে শেখা যায়; কিন্তু আইনের কাজকর্ম কী ভাবে চলে, তার অভিজ্ঞতা এই আপিস থেকেই আমি অর্জন করি। আর নানারকম লোককে দেখি। তারা প্রায় সকলেই বাঙাল এবং সম্পত্তি কেনাবেচা ও বন্ধক দেবার দালাল। তাদের ভিতর কেউ সৎ লোক নয়; এবং নানা রকম জুয়োচুরি করতে প্রায় সকলেই প্রস্তুত। এমনকী, একের সম্পত্তি অন্যের বলে বন্ধক দিতেও পিছপা নয়। আমি এই আপিসের দলিল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আবিষ্কার করি যে, কলকাতার কোন বড় বাড়ি দু-তিন পুরুষের বেশি এক পরিবারের সম্পত্তি থাকে না। আদি মালিকেরা প্রায় আর্মানি, ইহুদি বা ইংরেজ। আর আমি অনেক ধনী ছোকরাকে দেখেছি, যারা পাঁচ-ছয় বছরের ভিতর পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা কাপ্তেনি করে উড়িয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অ্যাটর্নির আপিসে কাজ করে idealist হওয়া যায় না। এই কারণেই বোধ হয় আমি idealist লেখক নই।

সে যা-ই হোক, এম এ পাশ করবার পর নানা স্থানে, যথা দার্জিলিং, আসানসোল, সীতারামপুরে ঘুরে বেড়াই। দার্জিলিং যাই বরফ দেখবার জন্য, আর সীতারামপুর প্রভৃতিতে ছোটখাটো কয়লার খনি দেখবার জন্য। অর্থাৎ বেকার সময়টাতে আমি কতকটা স্বশিক্ষিত হই। এই সময়ে আমি আবার সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করি। ইস্কুলে মুখস্থ করেছিলুম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও কলেজে ব্যাকরণ কৌমুদী। এ দুখানি ব্যাকরণের যে-অংশ আমার মনে ছিল, তাতে সংস্কৃত পাঠের বিশেষ সাহায্য হয়েছিল।

আমি Manzato নামক জনৈক ইতালীয় violinist-এর কাছে ইতালীয় ভাষা শিখতেও আরম্ভ করি। তিনি লেখাপড়া কিছু জানতেন না। সুতরাং তাঁর স্ত্রী আমাকে পড়াতেন। মহিলাটি ইংরেজি জানতেন না। ফলে আমি ইতালীয় ভাষায় কথোপকথন করতে বাধ্য হই।

এই সময়ে আমি দু-বার মধ্যপ্রদেশে রাইপুর যাই। আমার ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। একবার তাঁদের বাড়িতে এক মাস থাকি, আর একবার দু-দিন।

ইতিমধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশাহী যাই। লোকেন পালিত তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত দিন-পনেরো আমরা দু-জনে তাঁর অতিথি হয়ে থাকি। পরে আমরা নাটোর ফিরে আসি। আমার

উদ্দেশ্য ছিল আমার নিজ গ্রাম হরিপুরে যাওয়া, এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কলকাতায় ফিরে যাওয়া। নাটোরে বোধ হয় আমরা দিন-সাতেক থাকি। নাটোরের মহারাজার সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি বসেছিলুম, এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে যে দুটি বাবু এসে হলঘরে বসে আছেন। দাদা বললেন— 'প্রমথ, দেখো তো কে।' আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে, একজন সুপুরুষ এবং তাঁর বেশভূষা অতি পরিপাটি। তিনি হচ্ছেন নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন রাজশাহীর উকিল অক্ষয় মৈত্র, 'সিরাজদ্দৌলা'র লেখক। আমি আর মহারাজা উভয়েই প্রথম দর্শনে পরস্পরের love-এ পড়ে যাই। এবং সেই দিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা অতি অনুরক্ত এবং অন্তরঙ্গ ছিলুম। মহারাজা ছিলেন দূরসম্পর্কে আমার আত্মীয়। এবং আমাদের উভয় পরিবারের বহুকাল থেকে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবার শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। তাই তিনি বাল্যকালে তাঁর মাসি মহারানি কৃষ্ণমণির কাছে নাটোরে লালিত-পালিত হন। এবং নাটোর-রাজের যখন ভগ্নদশা উপস্থিত হয়; তখন আমার ঠাকুরদাদা ও মহারানি কৃষ্ণমণির ভ্রাতা, এই দুই শালা-ভগ্নীপতিতে মিলে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করবার চেষ্টা করেন। এ সব আমার শোনা কথা। তবে আমার ঠাকুরদাদা যে এই ব্যাপারে নাটোরে জেলে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্যি। এই সব কারণেই নাটোর-রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক এত দৃঢ় হয়েছিল। দাদা বিলেত যাবার পর রানি কৃষ্ণমণির পুত্রবধূ ও বাবার মাতৃস্থানীয়া রানি শিবেশ্বরী দাদাকে বিলেত থেকে ফিরিয়ে আনতে ও প্রায়শ্চিত্ত করতে বারাকে আদেশ করেন। বাবা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তখন আমি হেয়ার স্কুলে এনট্রান্স ক্লাসে পড়ি। তারপর থেকে আমাদের দুই পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর আমি এম এ পাশ করবার পর যুবক জগদিন্দ্রনাথ রায় নিজে থেকে আমাদের বাড়িতে এসে সেই ভাঙা-সম্পর্কে আবার জোড়া লাগান।

আমার রাজশাহী যাবার অব্যবহিত পরে মহারাজা সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা অক্ষয় মৈত্র এবং তিনি লোকেন পালিতের বাড়িতে আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে। এই সময়ে আমরা আবিষ্কার করি যে, মহারাজার ভদ্রতা অসাধারণ। ভূভারতে এমন জিনিস নেই, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না-করতুম। সে আলোচনায়

মহারাজাও যোগ দিতেন। এই সূত্রে আমরা আরও আবিষ্কার করি যে, মহারাজা অতি বুদ্ধিমান। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব ভালো ছিল না। তিনি সন্দেহ করতেন যে, তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। আমি সে ভয় কখনও পাইনি। আমার মনে হত সেটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ mood মাত্র, যাকে তিনি হৃদ্‌রোগ বলে ভুল করতেন।

সে যা-ই হোক, আমাদের এই সান্ধ্য সম্মিলনে লোকেন আর আমি ঘোর তর্ক করতুম। তার কারণ, লোকেনের সঙ্গে আমার কী সাহিত্য, কী আর্ট, কী ফিলজফি— কোন বিষয়েই মতের মিল ছিল না। লোকেন মধ্যে-মধ্যে Mill's Examination of Hamilton আমাদের পড়ে শোনাতে চেষ্টা করত, যা আমার অসহ্য বোধ হত, এবং রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই। আমি একটি কথায় তার মিল পড়া বন্ধ করে দিই। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করি— 'মিল কে?' তার উত্তরে সে বলে— 'মিল কে, তুমি জানো না?' আমি উত্তর করি, 'নামও কখনও শুনিনি।' লোকেন বললে, 'তা হলে তোমার কাছে মিল পড়া ব্যর্থ।' আমার এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করলেন। এর পর লোকেনের মিল পড়া বন্ধ হল। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে-মনে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়রি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু-কিছু আভাস পাওয়া যায়। লোকেনের সঙ্গে তর্কে আমার মতামতের অনুকূল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজ।

রাজশাহী থেকে নাটোর ফিরে আসবার পর দাঁতের ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ অতি কাতর হয়ে পড়েন। এবং মহারাজ যদু লাহিড়ী নামে তাঁর একটি আমলাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। যদু তিন দিন তিন রাত অবিরত তাঁর শুশ্রূষা করে। রবীন্দ্রনাথ ভালো হয়ে উঠলে তিনি ও আমি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার সংকল্প করি। কারণ ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে চিঠি পাই যে, হরিপুরে ওলাউঠার প্রকোপ হয়েছে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এম এ পাস করবার পর যে দু-বৎসর আমি বাড়ি বসেছিলুম, সে দু-বৎসরে আমি নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ছিলুম কলেজের ছোকরা, হয়ে উঠলুম একটি সামাজিক যুবক। আমি ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলুম। মহারাজা ছিলেন যথেষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও চমৎকার মৃদঙ্গ এবং বাঁয়া তবলা-বাজিয়ে। আমি মহারাজার সঙ্গে তাঁর সমবয়স্ক কলকাতায় বহু লোকের পরিচয় করিয়ে দিই। এবং তিনিও বাংলার বহু

পাড়াগেঁয়ে বড় জমিদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে বাংলা দেশের idle rich দলের হালচাল সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হই। মহারাজ এ দলের ভিতর unique ছিলেন। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন অতি সুরসিক, এবং repartee-তে সিদ্ধহস্ত, একরকম ধনুর্ধর বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আপোসে তলোয়ার খেলতুম। কিন্তু আমরা পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তরে কখনও পরস্পরকে আঘাত করিনি। এর থেকে যেন কেউ মনে না-ভাবেন যে, আমি সোজা কথা বাঁকা করে বলতে মহারাজার কাছে শিখেছি। আমি আসলে কৃষ্ণনাগরিক। আমি অল্পবয়স থেকেই কথার মারপ্যাঁচ কাকে বলে তা জানতুম।

আমরা রাজশাহী গিয়েছিলুম বোধ হয় শীতকালে। তারপর গ্রীষ্মকালে তৃতীয় বার দার্জিলিং যাই, আর তিন-চার মাস সেখানে থাকি। সঙ্গে ছিলেন বৌঠান (প্রতিভা দেবী), আমার দিদি (প্রসন্নময়ী দেবী) এবং আমার একটি পিসতুতো ভাই প্যারীমোহন সান্যাল। এক মাস আমি একরকম ঘোড়ার উপরেই ছিলুম। বর্ধমান এস্টেটের ম্যানেজার ফণী মুখুজ্যের দুটি ঘোড়া ছিল, একটি এস্টেটের, অপরটি তাঁর নিজস্ব। একটিতে চড়তেন ফণী, আর-একটিতে আমি। আমরা দু-জনে সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়া দাবড়ে ঘুরে বেড়াতুম। কখনও যেতুম সিঞ্চল, কখনও যেতুম দার্জিলিঙের সন্নিকট কোন-না-কোন চা-বাগানে। সে সব জায়গায় থাকত অসংখ্য জোঁক। আমাদের পায়ে পট্টি জড়ানো থাকত, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখতুম পট্টির উপরেও জোঁক ঝুলছে। আমি ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলুম না, কিন্তু ঘোড়া থেকে অদ্যাবধি কখনও পড়িনি। তার একটি কারণ আমার শরীর ছিল হালকা, আমি জিনের উপর শরীরের balance রাখতে পারতুম। দার্জিলিঙে ঘোড়ায় চড়া বোধ হয় নিরাপদ। আমি পরে অসম্ভব স্থূলকায় বাঙালি ভদ্রলোকদের ভুটিয়া টাট্টু ঘোড়ায় যাতায়াত করতে দেখেছি। সে যাত্রায় প্যারীদাদা আমাদের সঙ্গে একটি টাট্টুতে চড়ে রঙ্গিত যান। রঙ্গিত দার্জিলিং থেকে বোধ হয় দশ-বারো মাইল দূরে ও আগাগোড়া ওতরাই। অবশ্য তাঁর সইস ঘোড়ার লেজ ধরে সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়চ্ছিল। তিনিও নিরাপদে রঙ্গিত নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছেন। রঙ্গিতের উপর সেকালে দড়ির কিংবা বেতমোড়া একটি ঝোলানো ব্রিজ ছিল, যেটি পার হয়ে সিকিমে যাওয়া যেত। সিকিমের মেয়েরা দেখতে অতি সুন্দর।

এবার দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে অল্পদিনের ভিতর বিলেত যাই। যত দূর মনে পড়ে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর আমি বিলেত

যাত্রা করি। ১৭ অক্টোবর তারিখটা বোধ হয় ভুল নয়, কারণ ঐ তারিখেই বছরের পর বছর আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা কখনও দুঃখের, কখনও বা সুখের কারণ হয়েছে। বিলেতে যাওয়াটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিলেত না-গেলেও আমি এখন যা আছি তা-ই থাকতুম। আমি বিলেতে কোন বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়া শিখতে যাইনি। দাদা আমাকে বিলেত যাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, ও একবার বিলেত গেলে he will get a fresh lease of life. আমাকে তিনি বলেন, 'বিলেত গিয়ে যেন কোন য়ুনিভারসিটিতে ভরতি হয়ো না; তা হলে তুমি এ দেশে যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছ, সেই রকম পাস করবার চেষ্টা করবে, আর তাতে তোমার শরীর আরও ভেঙে পড়বে। ব্যারিস্টারি পাশ করা কিছু নয়, সে পরীক্ষায় তুমি অনায়াসে উতরে যাবে।' এর থেকে বুঝতে পারছেন যে, সেকালে আমার দেহ ছিল অতি কৃশ। কিন্তু বিলেতে যত দিন ছিলুম আমি একদিনের জন্যেও কোন অসুখে পড়িনি। অবশ্য আমি কোন ডিগ্রি নিয়ে ফিরিনি, ফিরেছিলুম কতকটা হৃষ্টপুষ্ট এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে।

আমি প্রসন্নমনে বিলেত যাত্রা করিনি। বাবা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। দেশে ফিরে হয়তো তাঁকে আর দেখতে পাব না, এই ভয় ছিল। উপরন্তু তিন-চার বছরের জন্য দেশ ছেড়ে যাবার সময়ে বোধ হয় সকলেরই মন অকারণে খারাপ হয়। আমাকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়েছিলেন আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরী, আর আমার বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আমার দাদা আশুতোষ চৌধুরী সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কি না ঠিক মনে নেই। জাহাজখানি ছোট্ট। ৩৫০০ টনের বেশি নয়। আমাদের কাপ্তেন পথিমধ্যে আমাকে বলেছিলেন যে, এইখানি বোধ হয় P & O কোম্পানির সবচেয়ে ভালো জাহাজ। বহুকাল সমুদ্রে ভাসছে; কিন্তু এ জাহাজের কখনও কোন বিপদ হয়নি। গঙ্গা-সাগরের মোহানা পেরিয়ে বেলা বারোটা-একটায় মহাসমুদ্রে অবতরণ করলুম। মহাসমুদ্র দেখে আমার প্রথমে মহা আনন্দ হয়। বিকেলের দিকে খালাসিরা দেখি মাস্তুল থেকে সব পাল খুলে ফেলছে। আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এর অর্থ কী?' তিনি বললেন, 'আমরা ব্যারোমিটার দৃষ্টে মনে করছি যে, একটি ছোটখাটো ঝড় আসছে, তাই আগে থাকতে জাহাজকে সামাল করে নিচ্ছি।'

বিকেলে ঝড় উঠল। সমুদ্রের জল তোলপাড় করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজও নাচতে শুরু করলে। এ নৃত্য লাস্য নয়— তাণ্ডব। ঢেউয়ের পিঠে চড়ে, উপরে উঠে পরক্ষণেই নিচে পড়ে। একে বলে 'পিচ' করা, 'রোল' নয়। এর ফলে প্রথমে গা-বমি করে, তারপরে শয্যাশায়ী হতে হয়। শরীরের এই অবস্থার নাম সি-সিকনেস। সে অসুখ যে কী কষ্টকর, যিনি নিজে তা ভোগ করেননি, তাঁকে কথায় বোঝানো যায় না। আমি সেদিন সন্ধ্যা থেকে শয্যাত্যাগ করতে পারিনি; পরের দিনও অবস্থা প্রায় সমানই ছিল। জাহাজে আরোহী খুব কম ছিল। সবে পাঁচ-ছয় জন মাত্র। তার ভিতর আমার পূর্বপরিচিত একটি বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন। নাম শশী মুখুজ্যে। তিনি ভাগলপুরের উকিল এবং W C Bonnerjee-র ভগ্নীপতি, তিনি বার বার আমার ঘরে এসে খোঁজ নিতে লাগলেন কেমন আছি। একটি ইংরেজ সহযাত্রী— নাম বোধ হয় General Channing— আমাকে এসে বললেন, 'এ রোগের কোন ওষুধ নেই; তবে তুমি যদি একটু-একটু শ্যাম্পেন sip করো, তা হলে এই বমির ভাবটা কিছু কমে যেতে পারে।' অপর এক সহযাত্রী ছিলেন সেকালের মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল— নাম বোধ হয় Dr Birch. তিনি এসে বললেন, 'শ্যাম্পেনে তোমার এ রোগ সারবে না। সমুদ্রের এই তোলপাড় বন্ধ হলেই তোমার এ অসুখ সেরে যাবে।' তার দু-দিন পরেই আমরা কলম্বোয় উপস্থিত হলুম। শশীবাবু বললেন, 'শুনলুম কলম্বোয় আমাদের দিন-তিনেক থাকতে হবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি জাহাজ আসবে, সেই জাহাজের জনকতক আরোহীকে আমাদের জাহাজে তুলে নিতে হবে।' তারপর তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে Galle Face হোটেলে তাঁর অতিথিস্বরূপ থাকতে হবে। আমি সেই হোটেলে গিয়ে উঠলুম, যদিও সেখানে খরচা বেশি, তিনি আমাকে ও তাঁর পুত্র সতীশকে প্রথম দিনটা কলম্বো ঘুরে দেখতে বললেন। কলম্বোয় দেখবার বিশেষ কিছু নেই; শুধু একটি ছোটখাটো মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে যাই। এমন শান্ত এবং নির্বিকার মূর্তি আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। সন্ধ্যাবেলা আমি ও সতীশ Cinnamon Gardens দেখতে যাই। এবং গুটিকতক ছোট-ছোট মরকুট্টে গাছ দেখে চলে আসি। হোটেলটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। বড়-বড় ঘর, সমুদ্রের ধারে। সেখানে একটি breaker ছিল, আর দিবারাত্র তার আওয়াজ কানে আসত। আমি এই প্রথম অনুভব করলুম যে, টেনিসনের Break, break, break— ছোট্ট কবিতাটি কত দূর সুন্দর ও

হৃদয়গ্রাহী। যথার্থ কবি ছাড়া আর কেউ এটি লিখতে পারত না। সমুদ্রের তটভূমির গায়ে ঢলে পড়ার অবিরত মৃদুধ্বনি মনকে উদাস করে দেয়।

আমার বাবার বন্ধু শশীবাবু বোধ হয় তার পরদিন আমাকে ক্যান্ডি নিয়ে যান। ক্যান্ডি একটি পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর জায়গা। এইখানেই ভগবান বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে। স্থানটি অতি মনোরম। ইংরেজি সভ্যতা এই বৌদ্ধ আশ্রমকে প্রায় আক্রমণ করেছে। বৌদ্ধ মন্দিরের অব্যবহিত পূর্বে দেখলুম একটি মাংসের দোকানে বড়-বড় গরুর ঠ্যাং ঝুলছে। এ দৃশ্য দেখে আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। মনে হল, ক্যান্ডি ছিল একটি বৌদ্ধক্ষেত্র, ক্রমে হয়ে উঠেছে রাবণের রাক্ষসপুরী। আমরা সেই দিনই কলম্বোয় ফিরে এলুম। পরের দিন শশীবাবু আমাকে কলম্বো থেকে কিছু দূরে আর-একটি নতুন হোটেল দেখাতে রেলে করে নিয়ে গেলেন। নামটি ঠিক মনে নেই। সেটি একেবারে সমুদ্রের ভিতর থেকে গেঁথে তোলা। ইংরেজরা আরাম জিনিসটা বোঝে। সেদিনই কিংবা তার পরের দিনই আমি কলম্বো ত্যাগ করলুম।

রাত বারোটায় জাহাজ ছাড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমরা ভারত সাগরে ভাসছি। Ceylon সম্বন্ধে আমার তিন-চার দিনের অভিজ্ঞতা এই : জনগণ সবই বাঙালির মতো দেখতে। তাদের শরীরে শক্তিও নেই, রূপও নেই। শুধু ক্যান্ডিতে পথচলতি নরনারী অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট। সিংহলে গাছপালার পাতার রং আমাদের দেশের মতো ঘোর সবুজ নয়, কচি পাতার মতো ঈষৎ তামাটে। বোধ হয় এই কারণেই সেকালে এই দ্বীপের অপর নাম ছিল তাম্রপর্ণী। ভারত সাগর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই। এ সাগর সে সময়ে ছিল একরকম প্রশান্ত সাগর। আমি তাই জল ছাড়া আর কিছু দেখিনি, এবং আবিষ্কার করি যে, সমুদ্রের রং নীল নয়, সবুজ। আমি সি-সিকনেসের জের টেনে চলেছিলুম। অর্থাৎ সমস্ত দিনই গা-বমি করত। স্টিমারের একটা বিশ্রী গন্ধ আছে। বোধ হয় এঞ্জিনের কয়লার ধোঁয়া রান্নাঘরের মাছ-মাংস রান্নার গন্ধ মিলিয়ে এই অপ্রীতিকর গন্ধের সৃষ্টি হয়। Red Sea-র মুখে প্রথম এডেন শহরে গিয়ে নামি। অমন sunburnt শহর আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। সমস্ত শহর এবং তার বাড়িঘরদোরের রং সব পোড়ামাটির, অর্থাৎ আমাদের দেশের হাঁড়িকলসীর রং। রাস্তায় বেদুইন দেখেছি, তারাও দেখতে বাঙালিরই মতো। কেবল তাদের রং বোধ হয় বাঙালির চেয়ে ফরসা। কিন্তু রোদের তাতে তাদের চামড়া সব ঝলসে কুঁচকে গিয়েছে।

এডেন ছেড়ে আমরা Red Sea-তে প্রবেশ করলুম। তার বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। দু-পাশে মরুভূমি আর তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপসাগর এবং তার অন্তরে ছোট-ছোট পাহাড় সব ডুবে আছে। সেই সব জলমগ্ন পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যা আমার বিশেষ করে চোখে পড়ে, সে হচ্ছে যে এই সমুদ্রে আরবরা ছোট-ছোট ডিঙিতে পাল খাটিয়ে এক হাতে হাল আর-এক হাতে পালের দড়ি ধরে তীরবেগে এ-পার ও-পার করছে। আমার এই সব পাল-খাটানো ডিঙি দেখতে খুব ভালো লাগে।

দিন দু-তিন পরে সুয়েজ হয়ে আমরা সুয়েজ খালে ঢুকলুম। এটি হচ্ছে মরুভূমির ভিতর খাল কেটে জাহাজ চলাচলের পথ খুলে দেওয়া। এই খালই আফ্রিকা ও এশিয়ার স্থলযোগ ছিন্ন করেছে; এবং য়ুরোপ ও এশিয়ার সঙ্গে জলযোগ স্থাপন করেছে। এই স্বল্পপরিসর নালা পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে গড়েছে। আমি এই সুয়েজ খালেই নানা জাতের জাহাজ দেখি। তুর্কিদেরও একখানি জাহাজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। ইউ-রোপের তুর্কিরা দেখতে প্রায় ইউরোপীয়দেরই মতো, তফাত এই যে, তাদের মাথায় হ্যাট নেই, আছে ফেজ। কিন্তু সম্প্রতি সে প্রভেদও উঠে গেছে। বিকেলের দিকে পোর্ট সইদে পৌঁছলুম। সেখানে গাইডের সঙ্গে শহরটি দেখতে গেলুম। এই গাইডরা নানা জাতের, কিন্তু তারা সকলেই চার-পাঁচটা ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারে। পোর্ট সইদ শহরটি একটি বদমায়েশির আড্ডা। সেখানে আছে অসংখ্য গণিকালয়। আর ছোট-ছোট কাফেতে বসে দেশের ভদ্রলোক সব কফি খাচ্ছে আর backgammon খেলছে। এরা দেখতে আকারে বৃহৎ ও বেশভূষায় পরিপাটি। তারা সব উচ্চ শ্রেণীর আরব, কি Egyptian বলতে পারিনে।

পোর্ট সইদ পার হয়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়লুম। মনে হল যে একটা নতুন পৃথিবীতে এসে পড়লুম। আকাশে আলো কম, এবং বাতাসে শীতের একটু শিরশিরে ভাব আছে। ইটালিকে পাশ কাটিয়ে জাহাজ চলতে লাগল। প্রথম-প্রথম দেখেছি শুধু জল। একজায়গায় কেবল সিসিলি ও ইটালির মধ্যে দিয়ে যখন জাহাজ এগোতে লাগল, তখন এই দুই দেশের তীরভূমি চোখে পড়ল। তারপর ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্সেই ছাড়া অন্য কোন জায়গা দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমি লন্ডন পর্যন্ত টিকিট কিনে ছিলুম, কিন্তু মার্সেইয়েই নেমে পড়লুম; লন্ডন পর্যন্ত বাকি পথটা প্যারিসের ভিতর দিয়ে রেলে যাব স্থির করে। আমার সঙ্গে দুটি সিংহলি

যুবকও ঐখানে অবতরণ করলেন। পূর্বে কখনও এঁদের জাহাজে দেখিনি; কারণ তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, আর আমি ছিলুম প্রথম শ্রেণীর। জাহাজের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা প্রথম শ্রেণীর ডেকে আসতে পারে না। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের গতি অবাধ। এই সিংহলি যুবকদের মধ্যে একজনের নাম Dr Baba. তিনি যাচ্ছিলেন এডিনবরাতে চিকিৎসাশাস্ত্র ভালো করে শিখতে। অপরটির নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন একজন burgher, অর্থাৎ সিংহলের ফিরিঙ্গি, দেখতে কিম্ভূতকিমাকার ও ঘোর শ্যামবর্ণ। ডাক্তারটি ছিলেন ফরসা, আর তাঁর নাক-চোখ সব আমাদেরই মতো। তাঁর মা ছিলেন ইংরেজ মহিলা, আর তাঁর মামা ছিলেন প্যারিসে একজন ব্যবসায়ী।

মার্সেই হচ্ছে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় শহর যা আমি দেখি। সেখানে বোধ হয় বারো ঘণ্টা ছিলুম। শহরটি আমার খুব ভালো লাগে। সেখানে ধুলো নেই, গরম নেই; বরং একটু শীতই আছে। লোকমুখে শুনলুম যে, ও-অঞ্চলে bise বলে একটি হাওয়া আসে, যা সঙ্গে নিয়ে আসে কনকনে শীত। আমার শীতবস্ত্র সব বাক্সপ্যাঁটরায় বন্ধ ছিল, তাই আমি একটি দোকানে গিয়ে একটি ছাতা ও একজোড়া fur-lined দস্তানা এবং fur-lined চটি কিনলুম। দাম খুব বেশি দিতে হয়েছিল। বিলাতে গিয়ে পৌঁছলে মেজদা আমাকে এই বলে ধমকান যে, আমাকে ফরাসি দোকানদার ঠকিয়েছে; বিলেতে যে-জিনিস পাঁচ শিলিংয়ে পাওয়া যায়, আমার কাছে তার জন্যে ত্রিশ শিলিং নিয়েছে। মেজদা তার পরদিনই Hope Bros.-এর দোকানে ছাতাটি যাচাই করতে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে আমাকে বললেন, তারা বলেছে এত দামি ছাতা আমাদের দোকানে নেই, উপরন্তু বলেছে যে, এ ছাতার দাম ত্রিশ শিলিংয়ের বেশি হওয়া উচিত। বিলেতে যে তিন-চার বছর ছিলুম, আমি ঐ তিনটি জিনিসই ব্যবহার করেছি। দেশে ফিরে এসেছিলুম ছাতাটি নিয়ে। ক্রমে তার কাপড় ছিঁড়ে গেলে আমার ভগ্নীপতি ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্যে তার বাঁটটি ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য আমার কাছে চেয়ে নেন। মার্সেই দেখলুম প্রথম শহর যাকে এককথায় জীবন্ত শহর বলা যায়। আমরা সেই রাত্রেই ট্রেনে প্যারিস যাত্রা করলুম। সে দেশের ট্রেনে শোবার কোন বন্দোবস্ত নেই। বড়-বড় আরামচৌকির মতো সিটে বসে যেতে হয়। সকালবেলা ফ্রান্সের যে-প্রদেশের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল, সে দেশ অতি মনোরম। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন স্টেশনে এক পেয়ালা চা পেলুম না, পাওয়া যায়

শুধু কফি। কফি খাবার অভ্যাস আমার ছিল না। এক পেয়ালা চা না-পেয়ে আমার ভারি অস্বস্তি করতে লাগল। আমি চা-খোর নই। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে চা না-পেলে ঘুম ভালো করে ভাঙে না। আমি এই তুচ্ছ কথাটির উল্লেখ করলুম এই জন্য যে, আমরা যে যা-ই হই, সকলেই বহু তুচ্ছ অভ্যাসের অধীন। মানুষ যাকে personality বলে, তা কতকগুলি বড় এবং অনেকগুলি ছোটর সমষ্টি মাত্র।

সকালবেলা প্যারিসের Gare de Lyons স্টেশনে একটি ঠিকে গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে শহরের একটি বড় হোটেলের অভিমুখে রওনা হলুম। প্রথম-প্রথম রাস্তাঘাট ভালো বা পরিষ্কার ছিল না। বড়-বড় লরিতে শাকসব্জি তরকারি ইত্যাদি যাচ্ছে। শেষটা Boulevard des Italiens-এ পৌঁছলুম। চমৎকার রাস্তা। দু-পাশে Cafe Riche প্রভৃতি বড়-বড় রেস্তরাঁ। গিয়ে নাবলুম Grand Hotel-এ। প্রকাণ্ড হোটেল, এবং আরামের সাজ-সরঞ্জামের কোন অভাব নেই। দিনটা কী করে কাটালুম মনে নেই। সন্ধ্যার পর হোটেলের সুমুখেই Opera House-এ গেলুম। আমি বিলাতি সঙ্গীতের কোন কালেই সমঝদার ছিলুম না। কিন্তু Wagner-এর Valkyrie-র Overture শুনে মনে হল যেন অন্য এক লোকে চলে গেছি। তিন-চারশ খানা বেয়ালা একসঙ্গে বাজছে নানা ভিন্ন সুরে; অথচ এ সব সুর পরস্পরে বিবাদ করে না, সকলে মিলেমিশে সঙ্গীতের ঝড় বইয়ে দেয়। এই বিরাট এবং প্রচণ্ড সঙ্গীতে লোকের কান চেপে ধরে তোল্লা-তোল্লা করে এমন এক লোকে নিয়ে যায়, যেখানে গানের ঊনপঞ্চাশ পবন উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডবনৃত্য করছে। এই ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ভিতরকার কথা হচ্ছে ধ্বনির পরিমাণ বাড়ানো; অপর পক্ষে আমাদের দেশের সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধ্বনিকে মৃদু থেকে মৃদুতর করা। এককথায়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের অর্থ হচ্ছে সুরের multiplication আর আমাদের হচ্ছে division. যাঁরা ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দু সঙ্গীতের আপোস-মীমাংসা করতে চান, তাঁরা এ উভয়ের গোড়াকার কথাটা ভুলে যান। আমি ইউরোপে থাকতে যখনই Wagner-এর কোন অপেরার অভিনয় দেখেছি, যথা Tannhauser, তখনই আমার এই একই কথা মনে হয়েছে। ইউরোপীয় সঙ্গীত আসলে যন্ত্রসঙ্গীত এবং ব্যক্তির সঙ্গীত নয়— সমষ্টির। Politics-এ যাকে বলে totalitarian, তা-ই। উল্লাসই হচ্ছে এর প্রধান গুণ। আমি প্যারিসে আর কী দেখেছি, তা আমার ভালো মনে নেই। যদি মনে করতে পারি, পরে লিখব। আমি বোধ হয় দু-রাত্রি প্যারিসে থেকে তারপর লন্ডন

রওনা হই। সঙ্গে impression নিয়ে আসি শুধু আলোর; এত আলো আমি ইউরোপের আর কোন শহরে দেখিনি। Parisian-রা নিশাচর। এবং সন্ধ্যাবেলায়ই এই শহর জেগে উঠে বিলাসে মত্ত হয়।

৩

তখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। শীতের প্রারম্ভে বিলেত দেশটা দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। তখনও বরফ পড়তে শুরু করেনি। আকাশ থেকে যা পড়ে তাকে তারা sleet বলে, অর্থাৎ গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বরফ মেশানো—অত্যন্ত অপ্রীতিকর। আকাশে কুয়াশা ক্রমে ঘন হয়ে আসে। লন্ডন শহরে কখনও-কখনও সে কুয়াশার রং হলদে হয়। ইংরেজরা তাকে বলে pea-soup fog. সে কুয়াশা এত গাঢ় যে সত্যি-সত্যি তাকে জিভ দিয়ে চাটা যায়। আর রাস্তাঘাট ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। সুখের বিষয় এই যে, এহেন হলদে কুয়াশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

আমি একদিন রিজেন্ট স্ট্রিটে এই fog-এর ভিতর পড়েছিলুম। ফগ্ কেটে গেলে দেখি বিলেতের পাকা চোররা এ পাঁচ মিনিটের ভিতর বড়-বড় দোকানের বড়-বড় শার্সি কেটে বহুমূল্য জিনিস নিয়ে গেছে। সেদিন আমি সেই চোরদের বাহাদুরি না-দিয়ে থাকতে পারিনি।

পূর্বেই বলেছি যে, আমি প্রথম ধাক্কায় সমস্ত ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিই এবং পাশ করি। তারপর দু-বৎসরের উপর টার্মস রাখবার জন্যে লন্ডনে থাকি। ১৮৯৬ সালের অগাস্ট মাসে আমি বিলেত থেকে দেশে রওনা হই। কিন্তু Calabria-র ভিতর দিয়ে ব্রিন্ডিসি পর্যন্ত আসতে আমার মনে হয় যেন sunstroke হয়েছে। আমি ব্রিন্ডিসি থেকে টিকিট বদলে লন্ডনে ফিরে যাই। মাসখানেক সেখানে থেকে তারপরে দেশে ফিরি।

আমি প্যারিস থেকে বরাবর লুসার্ন যাই। সেখান থেকে অনেকটা পথ স্টিমারে যেতে হয়। তারপর একটা স্টেশনে নেমে রেলে করে মিলান যাই। মিলানে একটা ভালো হোটেলে জায়গা পাই। মিলানের বড়বাজার বাড়ির খুব কাছেই ছিল। আমি রোজই সেটা দেখতে যেতুম। সে অঞ্চলে অনেক ইটালিয়ানের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁরা যে কীসের জন্য

সেখানে আসতেন, তা বলতে পারিনে। কারণ দোতলা-তেতলায় যেখানে ভালো জিনিস, সেখানে কখনও তাঁদের যেতে দেখিনি। মিলানে একটা অদ্ভুত বাড়ি দেখেছি। একটি ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটি মিলান শহরকে দিয়ে গেছেন। তাতে নানা রকম কারুকার্যের জিনিস আছে। সেখানে একটি দোয়াত দেখেছি যার কারুকার্য যথার্থই আশ্চর্য। এমনি প্রত্যেক জিনিসই অনন্যসাধারণ।

দিন-চারেক পর আমি মিলান থেকে ভেনিস যাই। ভেনিস একটা আশ্চর্য শহর। এখানে-ওখানে এক-আধটু মাটি আছে, বাকি সমস্ত শহরটায় জলপথে যাতায়াত করতে হয়। আমি একটা হোটেলে থাকতুম, সেটা গ্র্যান্ড ক্যানালের উপর। গলিঘুঁজির ভিতরেও গিয়েছি, সেখানে এত নোংরা যে বলা যায় না। গ্র্যান্ড ক্যানালের সুমুখেই এড্রিয়াটিক সি। আমি একদিন গ্র্যান্ড ক্যানালের উপরেই যে-সব গন্ডোলা বা ইতালীয় নৌকা থাকে, তাতে করে এড্রিয়াটিক সমুদ্রে বেড়াতে যাই। বোধ হয় লিডো নামক দ্বীপে যাই। আমি সেখানে বিশেষ কিছু দেখিনি। তবে যত দূর মনে পড়ে টমাস মান লিডো সম্বন্ধে একটা গল্প লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ভেনিস থেকে আমি বরাবর ফ্লরেন্স যাই।

ফ্লরেন্সে প্রথমে একটি ঘরেতে মাইকেল এঞ্জেলোর দুটি ছবি দেখি। তারপর Pitti Palace দেখতে যাই। সেটি বাইরে থেকে দেখতে কিছু সুন্দর নয়। কিন্তু ভিতরে বড়-বড় শিল্পীর হাতে আঁকা ছবিতে ভরা। ফ্লরেন্সে তিন-চার দিন থেকে রোমে যাই। রোম শহরটি উঁচু-নিচু। এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়া যেতে হলে গাড়ির ভিতর ব্রেক আছে তা-ই লাগাতে হয়। রোমের আর্ট বিরাট জিনিস। বোধ হয় কারাকাল্লার একটি মূর্তি আজও সেখানে টিকে আছে। আমি রোমে কলিসিয়াম দেখতে যাই। সে একটি প্রকাণ্ড কাণ্ড। রোম শহরে দেদার ফোয়ারা আছে। আমি একদিন ভ্যাটিকান দেখতে যাই। ভ্যাটিকান হচ্ছে রোমের পোপের রাজ্য।

রোম থেকে আমি নেপলসে যাই, সেখান থেকে Calabria-র ভিতর দিয়ে ব্রিন্ডিসি যাই। সেখান থেকে যে-জাহাজ কলকাতা যাবে, সেই জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বলল যে, রাস্তায় ভয়ানক গরম পাবে, সুতরাং এই টিকিটের উপর আমি তোমাকে এত টাকা দিতে পারি, তুমি সেই টাকা দিয়ে টিকিট বদলে লন্ডনে ফিরে আসতে পারবে। আমি তা-ই করলুম।

লন্ডনে ফেরবার সময়ে কোন্ ট্রেনে উঠি মনে নেই। বেলা পাঁচটায় Turin-এ পৌঁছই। স্টেশন থেকে সামনেই একটা রেস্তরাঁ পেলুম। সমস্ত

পথ কিছু খাইনি, তাই ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছিল। তারা বললে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে খেতে দিচ্ছি। পুরো কাপড় পরে খেয়েই শুয়ে পড়লুম। শুনলুম রাত বারোটায় একটা ট্রেন আছে, সেটা ধরলে বরাবর প্যারিস যাওয়া যায়। সমস্ত দিন উপবাসের পর আমি ভয়ানক ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

রাত বারোটার সময়ে একটা ওয়েট্রেস এসে আমাকে জাগালে। সে বললে, তুমি যে দেখছি ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার কি কালই প্যারিস যাওয়া দরকার? আমি বললুম, না। সে বললে, তা হলে আজকের রাতটা থেকে যাও। সে আমার পায়ের বুটজুতো খুলে দিলে, গায়ের কোট খুলে দিলে। তারপর আমি পড়ে ঘুমোতে লাগলুম।

তার পরের দিন আমি তাকে বকশিশ হিসাবে সামান্য কিছু দিলুম। আর ট্যুরিন শহর তার সঙ্গে দেখে বেড়ালুম। সে নিজের জন্যে একটা জিনিস কিনলে। এবং আমাকে তার দামের মধ্যে কিছু অংশ ফেরত দিলে। আমি অবশ্য সে টাকা ফিরে নিলুম না। ট্যুরিন শহরটি একেবারে নতুন। মিলান, ভেনিস, ফ্লরেন্স বা রোমের মতো পুরনো শহর নয়। ফিরতি পথে স্যাভয় দেশ দেখলুম। সে অতি সুন্দর দেশ। পরদিন ভোরবেলা গিয়ে প্যারিসে পৌঁছলুম। স্টেশনে cafe au lait ও ছোট-ছোট রুটি খেলুম। দুই-ই খেতে চমৎকার। প্যারিসের স্টেশন থেকে লন্ডন চলে এলুম। মনে হল, দেশে ফিরলুম। Tavistock square-এ গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। শুনলাম মেজদাদা Porloch বেড়াতে গেছেন।

তার পরের দিনই আমি লোকেনদের বাড়ি গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি খাঁ হাজির আছেন, এবং দীপনারায়ণও আছেন। আমি দীপনারায়ণকে আস্তে-আস্তে বললুম যে, খাঁ-র এখানে থাকা হবে না। তিনি বললেন যে, আমরা একটি বেশ বাড়ি পেয়েছি, খাঁ গিয়ে অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। খাঁ-কে সঙ্গে নিয়ে আমরা দীপের বাড়ি গেলুম। সে বেশ বাড়ি। দীপ বলেন যে, খাঁ-র নিলের প্রতি মোহবত হয়েছে। আমি বললুম, সে মোহবত ভাঙাতে হবে। কেমব্রিজের কথা মনে আছে তো? কেমব্রিজে নিলের একটি ব্যবহারে আমরা তিনজনে একটু বিরক্ত হয়েছিলুম। এবং সেই জন্যে কাউকে না-বলা-কওয়া আমরা লন্ডনে ফিরে আসি। আমি সে সময়ে ইটালিতে পায়চারি করছিলুম, সেই সময়ে লোকেনরা খাঁ-কে নিয়ে লেক ডিস্ট্রিক্টে বেড়াতে যায়। এবং সেখান থেকেই নিলের সঙ্গে খাঁ-র খুব মোহবত হয়। এবং মোহবতে আমি কস্মিনকালে বিশ্বাস করিনে। তার পরের দিনই আমি পর্লক চলে গেলুম। সেটি আমার পূর্বপরিচিত জায়গা।

Ilfracombe থেকে লন্ডন ফেরবার পথে আমি উক্ত স্টেশন পেরিয়ে আসি। পর্লকের স্টেশন বোধ হয় শহর থেকে একটু দূরে। পর্লক একটি ছোট্ট শহর। সেখানে কলকাতার হাইকোর্টের জজের ভাগ্নে পার্নেল বলে একটি আর্টিস্ট থাকতেন। মেজদাদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আমরা যে-বাড়িতে থাকতুম সেখানে খুব ভালো খাবার দিত। সকালবেলা' স্ট্রবেরি, চাকভাঙা মধু ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আমরা রোজই পার্নেলের বাড়ি যেতুম। তাঁর মা কিছুদিন ছেলের কাছে এসেছিলেন। মা-টি অল্পবয়সে বোধ হয় খুব সুন্দরী ছিলেন। তিনি থাকতেন Weston-Super-Mare-এ। তিনি পর্লক ছেড়ে চলে গেলে আমি সেখান থেকে তাঁর একখানি চিঠি পাই। আমি টাকার অভাবে Weston-Super-Mare-এ যেতে পারিনি।

পার্নেলদের বাড়ির অনতিদূরে লেডি কার্মন বাস করতেন। আমি তাঁর ওখানে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি এক বোতল হুইস্কি খোলা রয়েছে, তা ছাড়া দু-চার পেয়ালা চা আছে। দেখে মনে হল স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আমি পূর্বপরিচিত। Ilfracombe-এ যে-হোটেলে ছিলুম, সেখানে তিনি মধ্যে-মধ্যে গিয়ে থাকতেন। স্ত্রীলোকটি মোটেই সুন্দরী নয়। হুইস্কি আমি বিলেতে কখনও খাইনি। সুতরাং বলা বাহুল্য, দুই-এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি সেখান থেকে চলে এলুম। পার্নেলদের বাড়ি ফিরে দেখি চায়ের চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন— চা কী রকম খেলে? আমি বললুম— সেখানে হুইস্কি চলছে, চা-র সরঞ্জাম কিছু নেই। মিসেস পার্নেল বললেন— These horsey women don't care for anything hut whiskey and horses. আমি চলে আসবার সময়ে তিনি আমাকে ও সমস্ত পার্নেল পরিবারকে নিমন্ত্রণ করলেন পর্লকের কিছু দূরে একটি fox-hunting দেখতে। আমি, সেজদা আর পার্নেল পরিবারের কেউ-কেউ সেই fox-hunting দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি একপাল মেয়ে জুটেছে। তার ভিতর লেডি কার্মন একটি ঘোড়ায় চড়ে রয়েছেন। আমরা পুরুষমানুষরা যে-ভাবে ঘোড়ায় চড়ি, সেই ভাবে! খানিকক্ষণ পর কে একজন সিটি বাজালে, আর সব ঘোড়সওয়ার একসঙ্গে ঘোড়া ছেড়ে দিলে, একটি fox-এর পিছনে। ঘোড়সওয়াররা fox-এর আওয়াজ পেয়ে বনজঙ্গল সমস্ত ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু fox মিলল না। এই fox-hunting-এর আমি ইতিপূর্বে কোন কাগজে লম্বা বর্ণনা করেছি। তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

পর্লক থেকে কিছু দূরে একটা মেলা দেখতে গিয়েছিলুম। মেলা বিশেষ কিছুই নয়। আমাদের দেশে যে-রকম মেলা হয়, ঠিক সেই রকম। একজায়গায় একটি জুয়ো খেলবার বোর্ড আছে। একটু দূরে শুনলুম একটি ভাঙা সেকেলে বাড়ি আছে। একটি টাঙা ভাড়া করে আমি ও মিসেস পার্নেল সেটি দেখতে গেলুম। যত দূর মনে পড়ে এ ভাঙা বাড়ির ইতিহাস আমি গল্পচ্ছলে লিখেছি। তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

পর্লকে যে-কদিন ছিলুম একরকম ভালোই ছিলুম। সেজদার মেয়াদ ফুরলে আমরা Tavistock square-এ ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে আমরা একবার সেজদাকে Holborn circus-এ পৌঁছতে গিয়েছিলুম। পথে এমনি snow-storm এল যে আমরা সব ভূতের মতো হয়ে এলুম। সেখান থেকে আমরা হেঁটে বাড়ি ফিরলুম। সেজদার স্টেশনে পৌঁছনো ব্যাপারটা পর্লক থেকে ফেরবার পরে কিংবা পূর্বে, তা আমার ঠিক মনে নেই। এই পর্যন্ত মনে আছে যে, খাঁ তখন Tavistock square-এ থাকুন না-থাকুন, সেখানে নিত্য আসতেন।

আমি যখন দেশে আসবার জন্য দ্বিতীয় বার জাহাজে চড়ি, খাঁ উপস্থিত ছিলেন। আমরা অন্য অনেক বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। এবার লন্ডনে জাহাজে চড়ি, এবং বরাবর বম্বে পর্যন্ত এসে পৌঁছই।

জাহাজে অনেক কাণ্ডকারখানা হয়। একটি হিন্দুস্থানি ব্যাপারি আমাকে এসে বলেন যে, আমার সিট যেন তাঁর পাশে পড়ে যাতে তিনি ভুলে শুয়োরের মাংস না-খান। তারপরে আমি আবিষ্কার করলুম যে, তিনি যথেষ্ট মদ্যপান করেন। তিনি আমার নাম সই করে রোজ এক পাইট করে শ্যাম্পেন খেতেন। আমি তাঁকে বললুম যে, আমার হাতে যথেষ্ট পয়সা নেই। বম্বে পৌঁছবার সময়ে তিনি শ্যাম্পেনের দাম আমার ঘাড়ে ফেলে চলে গেলেন। তিনি আগের দিন আমাকে বলেছিলেন যে, জাহাজের সব পাওনা আমি দিতে পারব না। আমাদের এক সহযাত্রী আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার কোন ভাবনা নেই, টাকা আমি দেব। তুমি টমাস কুক-এর ওখানে আমার নামে টাকাটা জমা করে দিও। আমি পরের দিন সকালবেলা মনমরা হয়ে আছি দেখে তিনি আমাকে দশ পাউন্ড করে দশখানা ইংলন্ডের ব্যাঙ্কনোট দিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে পাঁচখানা নোট নিই, আর পাঁচখানা ফেরত দিই। সেই পাঁচখানা নোটে জাহাজের দেনা শোধ করে আসি।

তারপর আর-একটি ইংরেজ ছোকরা ছিল আমার সঙ্গে, একই বড় হোটেলে। তার সঙ্গে জাহাজেই পরিচয় হয়। আমার হাতে যত টাকা উদ্বৃত্ত

ছিল তা একদিনেই সব খরচ হয়ে যায়। সে ছোকরাটি আমাকে বলে, তোমার যত টাকার দরকার হবে আমি তোমাকে ধার দেব। আমি ঘুরতে-ঘুরতে একদিন কলকাতায় গিয়ে হাজির হব। তোমার নাম ও সেখানকার ঠিকানা লিখে দাও, এ টাকা কলকাতা গিয়ে ফিরে নেব। আমার ঠিক মনে নেই পাঁচ-সাত পাউন্ড না কত তার কাছে ধার নিয়েছিলুম। সে কলকাতায় এলে সে টাকাটা আমি তাকে দিয়ে দিই। ট্রেনে এবং জাহাজে আমি ইংরেজদের কাছে খুব ভালো ব্যবহার পাই।

জাহাজে আর-একটি উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পরে শুনলুম তিনি মালটার গবর্নর। আমাদের জাহাজ মালটায় গিয়ে পৌঁছতেই কতকগুলি তোপধ্বনি হল, এবং সাহেব তার অ্যাডমিরালের ঝাপ্পাঝোপ্পা পরে নেবে যাবার সময়ে আমাকে বলে গেলেন— মালটায় যদি নাবো তো আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। তোমার সঙ্গে জাহাজের কোন লোক থাকে তো তোমারও গবর্মেন্ট হাউস দেখা হবে না।

আমি বাড়ি ফিরে দেখি কলকাতায় আমাদের বাসায় এক মেজদা ছাড়া জনমানব নেই। বাকি সব দার্জিলিঙে। আমি কার্শিয়াঙের স্টেশনে দাদাকে এবং রবিবাবুকে দেখে হেসে ফেলেছিলুম। দাদা একটু হেসে বললেন— থাকো এখানে কিছুদিন, তোমাকেও আমাদের মতো অলস্টার চড়াতে হবে। আমি বললুম— বোধ হয় না। দাদা বললেন, আমি আর রবি, আমরা দু-জনে এখানে ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে কিছুদিন থেকে আছি। মহারাজা আমাদের জোর করে এই বেশ পরিয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, শীতের দেশ, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে। দাজিলিঙে গিয়ে দেখি দাদা ও সিংহ-সাহেব দুটো জোড়া বাড়ি নিয়েছেন। দাদার বাড়িতেও ঢের লোক, সিংহের বাড়িতেও তা-ই। সিংহ-সাহেবের বাড়িতে বোধ হয়, কে জি গুপ্ত সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন, তাঁকে নতুন সিভিলিয়ান বীরেন সেন বিবাহ করেন। আমার বিশ্বাস যে দুর্গামোহন দাসের বড় ছেলে সত্য দাসও সেখানে ছিলেন, অন্তত কিছু দিনের জন্য। এর পরে বোধ হয় তাঁরা বহু দূরে সিঙ্গামারিতে নিজের ভগ্নীপতির বাড়ি থাকতে যান। সে যা-ই হোক, দার্জিলিং গিয়ে একটি নতুন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। সে হচ্ছে মহারাজা কুচবিহারের পরিবার। মহারাজার তিনটি অবিবাহিতা শ্যালিকা ছিলেন, এবং একটি বিবাহযোগ্য কন্যা। আমি তখন অবিবাহিত। দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়, সুতরাং মহারানি যে আমাকে উপযুক্ত মনে করবেন— তাতে আর আশ্চর্য কী? তার উপর

দ্দদা কৃতী ব্যারিস্টার। মহারানির ভগ্নীত্রয় সকলেরই পরে খুবই ভালো বিবাহ হয়েছে। একটির বিবাহ হয়েছিল উড়িষ্যার জনৈক মহারাজার সঙ্গে; আর-একটির ব্যারিস্টার স্বামী পরে বর্মায় হাইকোর্টের জজ হন; তৃতীয়টির বিবাহ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের সঙ্গে।

মহারাজার কন্যা এবং মধ্যমকুমার বেশ ভালো নাচতেন। সে নাচ আমাদের খুব ভালো লাগত। দেখেই বোঝা যেত যে কোন নাচের কারিগরের দ্বারা এরা সব শিক্ষিত। মহারাজা নিজে খুব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাঙালি ছেলেদের জন্যে একটি ওরিয়েন্ট ক্লাব দার্জিলিঙে স্থাপন করেন।

সত্য কথা বলতে গেলে, এই প্রথম বড়মানুষের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, এবং তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সবই আমাদের খুব ভালো লাগত। মহারাজার সঙ্গে কলকাতার ইহুদি ধনী পরিবার এজরাদের খুব ভাব ছিল। কলকাতায় লেডি এজরাদের ওখানে একদিন আমি খানা খেতে যাই। সে বাড়িতে একটি চমৎকার রুপোর হুঁকো দেখি।

পূর্বে বলেছি মহারানির তিন ভগ্নীরই ভালো বিবাহ হয়েছিল। আমি বিবাহের পর একবার আলিবাগে যাই। আমার বন্ধু জোৎস্না ঘোষালের সঙ্গে মহারাজকুমারীর বিবাহ হয়েছিল, তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন। সেখানে গিয়েই বুঝলাম যে এ বিবাহ Mésalliance হয়েছে। আমার এ অনুমান নেহাত ভুল হয়নি। সত্য কথা বলতে হলে, এই কুচবিহার পরিবারের মোহ আমাকে লেগেছিল, এবং তাদের সঙ্গে আমার শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় ছিল, অর্থাৎ যত দিন মহারানি সুনীতি দেবী বেঁচেছিলেন। যদিচ আমি কোন বৈদ্যকন্যা বিবাহ করিনি।

৪

আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে আমার পুরনো বন্ধু, যথা মহারাজা নাটোর প্রভৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতুম। তাঁর সঙ্গে প্রায় নিত্যই সাক্ষাৎ হত। কুচবেহারের দলের সঙ্গে আমি তাঁর পরিচয়

করিয়ে দিই। কিন্তু এ দুই দলের তেমন সদ্ভাব হয়নি। নাটোরের মহারাজ ছিলেন অতি সুরসিক লোক এবং তিনি মধ্যে-মধ্যে এমন রসিকতা করতেন যে, কুচবেহারের শ্যালকবাবুরা বোকা বনে যেতেন। ইতিমধ্যে লোকেন পালিতের কলকাতায় আবির্ভাব হয়। তিনি কোন ডিনার-পার্টিতে উপস্থিত থাকলে সেখানে শ্যাম্পেন দেখলে excited হয়ে উঠতেন। এবং শ্যাম্পেন সম্বন্ধে নানান রসিকতা করতেন। আমার মনে আছে যে তিনি একদিন যখন এই রকম রসিকতা করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলে বসলেন যে, শ্যাম্পেনের গেলাস একমাথা শ্যাম্পেন নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু বেঁকছেও না, চুরছেও না। এই জাতীয় রসিকতা নাটোরও করতে পারতেন না, আমরা তো নয়ই।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে আমার বিলেত যাবার বহু পূর্ব থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এবার তাঁর মারফত কলকাতার শৌখিন বড়মানুষের দলের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। এ দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। তিনি সে সময়ে একজন ম্যুনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। প্লেগ কলকাতায় এলে কলকাতার লোক মহা হুজুগ বাধাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্মথ মিত্র এবং হেম মল্লিক দু-জনে বাঙালিটোলার একটা বাড়িতে দেখতে গেলেন ব্যারামটা সত্যি প্লেগ কি না, দু-জনেই ফেরবার পথে আমাদের ওখানে এলেন। এবং বললেন যে, হাঁ, সত্যিই প্লেগ। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শেয়ালদহ স্টেশনে অসম্ভব যাত্রীর ভিড় হতে লাগল। দেশের লোক দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমরা ভাইরা প্লেগের সময়ে কলকাতায় ছিলুম। আমায় ভগ্নীপতি ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্জে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, রোজ সন্ধ্যাবেলা এক পেগ করে ব্র্যান্ডি খেলে প্লেগের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে। সেই অবধি আমার ব্র্যান্ডি খাবার অভ্যাস জন্মাল।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের তখন অবস্থা খুব খারাপ। রাজেন মুখুজ্জে তাঁর ডকের কোম্পানি হাতে নিয়ে তার খুব উন্নতি করলেন। এবং আমার ধারণা, হেমের ছেলে নীরদ মল্লিক এই ডকের প্রসাদের এবং তার দাদামহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে কলকাতার ভিতর একজন মস্ত বড়মানুষ হয়ে উঠেছিল। এই সব শৌখিন বড়মানুষের দলে মিশে আমি দেদার গার্ডেন-পার্টিতে যাই। প্রধানত দমদমে মন্মথ মিত্রের বাগানবাড়িতে। সেখানে নাচগান হত। আমি বিবাহের পর এ দল ত্যাগ করি।

গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখুজ্জের সঙ্গে আমার বহুকাল থেকে পরিচয় ছিল। তাঁর দুটি ব্যসন ছিল, শিকার এবং সেতার। সুরবাহার তিনি চমৎকার বাজাতেন। আমি কোন বাঙালির কাছে এরকম সুরবাহার শুনিনি। দক্ষিণি সুর তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি খুব বড়-বড় সুর-বাহারীর কাছে সুরবাহার শুনেছিলেন। রামপুর থেকে আগত উজির খাঁ-র বাজনা বোধ হয় শুনেছিলেন। তাঁর বাজনা শুনে জ্ঞানদাপ্রসন্নের মাইনে-করা ওস্তাদ মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন। এবং ক্রমে কলকাতার সমস্ত ওস্তাদ তা-ই করলেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের ইচ্ছা ছিল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, কিন্তু তিনি মুসলমান ওস্তাদের পাদোদক পান করতে স্বীকৃত হলেন না। হয়েছিলেন শুধু খড়দার জনৈক বিশ্বাস। বিশ্বাসমহাশয় যে কী রকম বাজিয়ে হয়েছিলেন তা আমি জানিনে। সেকালে গল্প শুনেছি যে, রামপুরের নবাব ভালো-ভালো বাজিয়েদের সপ্তক করতেন। অর্থাৎ সাত দিন ধরে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতেন, খালি তাদের যন্ত্র সঙ্গে দিয়ে।

এই সব শৌখিন জমিদারমণ্ডলী যে-সব মেয়েদের বাগান-পার্টিতে আনতেন, তাঁরা দেখতে মোটেই সুন্দর ছিলেন না— একটি ছাড়া। কিন্তু তিনি বাঙালি নন, লক্ষ্ণৌয়ের মেয়ে। নাচ শিখেছিলেন কল্কা ও বিন্দা মহারাজের কাছে। এ ভ্রাতৃযুগল ছিল অদ্ভুত নাচিয়ে। তার উপর মেয়েটি ছিল অতি মিষ্টভাষী। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। নাটোরের মহারাজার বাড়িতে একটি জলসাতে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার বহুকাল পরে আর-একটি জলসায় তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ পাই। তিনি তখন জব্বলপুরের রাজা গোকুলদাসের পুত্র জীবনদাসের নোকরি করতেন। তিনি আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠান এবং আমার কাছে তাঁর নতুন চাকরির ঘোর নিন্দা করতে থাকেন। জীবনদাস নাকি গানবাজনার কিছু বোঝেন না, তবে তিনি তাঁকে হাজার টাকা করে মাইনে দেন বলে বাধ্য হয়ে চাকরি করতে হয়। আমার প্রতি তাঁর একটু প্রীতি ছিল। নাটোরের বাড়ির একটি জলসায় আমি ও আমার বন্ধু দীপনারায়ণ সিং দু-জনে পরামর্শ করে দেদার শ্যাম্পেন খাই। তার ফলে আমার নেশা হয়েছিল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেম মল্লিকের কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে। আমি তখন ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম যে, হেমের কোন দোষ নেই। অতিরিক্ত শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করবার ফলে আমি যে বারবার এক কথা বলছি, সে জ্ঞান আমার ছিল। তার পাশের ঘরে

বাইজিরা বসে ছিল। আমি মধ্যে-মধ্যে সেই ঘরে যাচ্ছিলুম। এবং এই লক্ষ্ণৌয়ের মেয়েটির সঙ্গে অন্য কথাবার্তাও বলছিলুম। রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ করেছিলেন। এ মেয়েটির প্রতি আমার প্রীতি ছিল। তার নাম বোধ হয় মাহেমুনীর। আমি তাকে দশ বছর পরে যখন দেখি, তখন তার চেহারা সমানই ছিল। শরীর লম্বা, ছিপছিপে এবং মুখটি গোল। বিবাহের এক বৎসর পর একবার লক্ষ্ণৌ যাই। এবং দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চক দেখতে যাই। কিন্তু মাহেমুনীরদের বাড়ি খুঁজে পাইনি। লক্ষ্ণৌ চকে অসংখ্য গলিঘুঁজি আছে। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকেরা সেই সব গলি-ঘুঁজিতে ঢুকে গেলেন! এবং বহু কষ্টে আমি তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলুম। লক্ষ্ণৌয়ের চকের মতো এ রকম বিশ্রী জায়গা আমি আর কখনও দেখিনি।

ইতিমধ্যে আমি একবার নাটোরের মহারাজার সঙ্গে মাস-তিনেকের জন্য সিমলে পাহাড়ে যাই। সেখানে লক্‌কড়বাজারে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিই। লক্‌কড়বাজার থেকে শ্রীধর বলে একটি ভদ্রলোক প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে আসতেন, এবং আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি তিনি কমিস্যারিয়েটে চাকরি করতেন। তিনি Murree, চম্বা, এই সব জায়গায়ই বাস করতেন। কমিস্যারিয়েটে কখনও-কখনও দেদার টাকা রোজগার করতেন। বিশেষত তিনি যখন বড়সাহেবের প্রিয়পাত্র হতেন। সে দেশের পার্বত্য রাজারা তাদের রাজ্য থেকে বড়-বড় গাছ কেটে জলে ভাসিয়ে দিত, সেই সব অনেক সময়ে শ্রীধর নিজের বলে দাবি করতেন। বহু বার পার্বত্য রাজাদের মামলায় তাঁর বিচার হয়েছে এবং বহু বার তিনি সে সব মামলায় জিতেছেন। শ্রীধরের ধরনধারণ দেখে ও কথাবার্তা শুনে মনে হত যে তিনি একজন মহাফক্কড়। এর প্রমাণ পাওয়া গেল নাটোরের মহারাজা লক্‌কড়বাজার থেকে উঠে গেলে। একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে তিনি উঠে যান। শ্রীধর সঙ্গে-সঙ্গে সেই বড় বাড়িতে এলেন। এবং প্রায় বছরখানেক ধরে সেইখানেই রইলেন। এ কথা আমি চলে আসবার পরে শুনেছি। আমার বিশ্বাস তিনি লক্‌কড়বাজারে গোটা-দশেক টাকা মাইনের কোন কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি জনাইয়ে। তিনি ছেলেবেলায় কোন একটি পলটনের সঙ্গে কুচ করতে-করতে এত দূর এসে পড়েন। এবং সেই অবধি এই আর্মিতেই রয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখনও অবিবাহিত শুনে তিনি বলেন— গতা বহুতরা কান্তা স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী। যৌবনের আগেই বুক ফুলিয়ে হিজলি

যেতে হয় আর ছ-মাস পর-পর চিঁ-চিঁ করে সেখান থেকে ফিরতে হয়। বছরখানেক পরে শ্রীধর সিমলা থেকে নাটোরের মহারাজার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলেন। দিন-পনেরো বাদে তিনি লক্‌কড়বাজারে যার আশ্রয়ে থাকতেন, তার সঙ্গে জনাইয়ে ফিরে গেলেন। তারপর তার সম্বন্ধে আমি আর কিছু শুনিনি।

সিমলে শহরে আমি নাটোরের মহারাজার সঙ্গে একটি বাড়িতে গিয়েছিলুম। বাড়িটি দেখে ফিরে আসি। ফিরি ছোট সিমলার পথে। সেই পথেই আমি কাশ্মীরের মহারাজার বাড়ি দেখি। সে সময়ে দিঘাপতিয়ার রাজা সেখানে ছিলেন। এবং তিনি চংদার বলে একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বেচারাকে তিনি পায়ে হাঁটিয়ে সমস্ত সিমলা শহর ঘুরিয়ে বেড়াতেন। নিজে অবশ্য রিকশয় চড়তেন। একদিন দিঘা-পতিয়া চংদারের সঙ্গে আমাদের বড় বাড়িতে আসছিলেন। পথিমধ্যে আমি এবং নাটোরের মহারাজা আমরা অবশ্য তাঁকে প্রতি-নমস্কার করলুম। কিন্তু মহারাজার একটি আমলা পৈতে হাতে করে দিঘাপতিয়াকে আশীর্বাদ করলেন। এর দরুন দিঘাপতিয়ার রাজা ভয়ানক চটে যান। কী ব্যাপার হয়েছিল তা পরে বলব। দিঘাপতিয়া আস্তে-আস্তে আমাকে বললে— নাটোরের এক-এক আমলা অতি অভদ্র। নাটোরের সঙ্গে ভটচায বলে একটি আমলা ছিল। ভটচায যে আশীর্বাদ করেন সে আমার চোখে দেখা। নাটোর বাড়ি ফিরে এসে ভটচাযকে ডাকালেন এবং তাকে বললেন— তুমি তো ছেলেবেলা থেকে আমাকে নাস্তিক করবার চেষ্টা করেছ। ভটচায বললে— এ কথা ঠিক। এবং তাতে আমি কৃতকার্যও হয়েছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং তেলিতে একটা প্রভেদ আছে, তা তো আপনি স্বীকার করেন না। মহারাজা বললেন— তুমি দূর থেকে কী করে টের পাও যে, কে ব্রাহ্মণ আর কে নয়? ভটচায হেসে বললে— দূর থেকেই টের পাওয়া যায়। গায়ের গন্ধে।

তারপর শুনলুম নাটোরের সঙ্গে দুটি ছোকরা ছিল, তারা অদৃশ্য হয়েছে। পরের দিন একজন ফিরে এল। তাকে সকলে 'মাস্টার' 'মাস্টার' বলে ডাকত। মহারানির সে একরকম আত্মীয় ছিল। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগত, তার অনুরোধে মহারাজ তাকে সিমলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে আবিষ্কার করা গেল যে, সে সব রকম নেশা করে। মহারাজাকে ফ্রেঞ্চ পড়ায়, এই কথা সে প্রচার করে বেড়াত। অপর ছোকরাটির নাম হরে, সে গাইতে পারত, নাচতে পারত। দু-দিন পর সে-ও দেখা দিলে।

সে ফিরে এলে মহারাজা নাটোর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে তাকে কেলু গাছে বেঁধে চাবকাতে হুকুম দিলেন। শুনলুম যে, জার্মান সাহেবদের একটি আমলা 'ধুত্তোর আপিস' বলে এই ছেলেদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। সে তার খুশিমতো আপিস যেত-আসত। সে-ও বাঙালি। লোকটি শুনেছি খুব কর্মক্ষম ছিল, এবং অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। তার জার্মান মনিবদের সে-ও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।

মাস্টারমশায় এবং হরের কুকীর্তি সিমলে-সুদ্ধ প্রচার হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে নগেন্দ্রবাবু এবং তাঁর এক বন্ধু নাটোরের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন এই বলে যে, তিনি সিমলের কোন একটি আপিসে আমলাগিরি করেন। তিনি গানবাজনা ভালো করে শেখেননি, তবে গানবাজনা ভালোবাসেন বলে কিছু-কিছু চর্চা করেছেন। তিনি অশিক্ষিত বলে হারমনিয়ামের কোন সুর দিলে তার সঙ্গে গলা মেলাতে পারতেন না।

সিমলেতে কাঞ্চী বলে একদল গাইয়ে-বাজিয়ে আছে। তাদের শুনি মেয়েরা বড় হলে বেশ্যাবৃত্তি করে। আমি এ দলের গানবাজনা শুনেছি। একটি পাঁচ-ছ বছরের মেয়েকে তার বাপ-মা আমাদের কাছে গান শোনাতে নিয়ে এসেছিল। নগেন্দ্রবাবু সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটি প্রথমত একটি ওস্তাদি ধরনের গান গাইল। পরে একটি লাউনী গাইলে। দুটি গানই ভালো।

আমি ডিসেম্বর মাসে সিমলা ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসি। যে-এক বৎসর কলকাতায় ছিলুম, সে বৎসর যে আমি কী করেছিলুম তা মনে নেই। তবে ১৮৯৭ সালে জুন মাসে যে-ভূমিকম্প হয়, সে সময়ে আমি নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলুম তা মনে আছে। আমার যত দূর মনে পড়ে আমি কোন একটি বাংলা মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি, তাতে সিমলা ও নাটোর দুই জায়গারই বর্ণনা ছিল। বোধ হয় সঙ্গীত সম্বন্ধেই বেশি কথা ছিল।

পরের বৎসরের প্রধান ঘটনা আমার বিয়ের সম্বন্ধ। ইতিমধ্যে সরলাদেবী চৌধুরানী একদিন আমাকে বলেন যে, আপনি ইন্দিরা দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হবেন। আমি সেই কথা শুনে বিবাহের প্রস্তাব করি। তিনি প্রথমে বলেন যে, মা-কে জিজ্ঞাসা করে তবে বলব। তারপর তিনি মা-কে জিজ্ঞেস করে বললেন যে, তাঁর মত আছে। এ প্রস্তাব বোধ হয় ১৮৯৮ সালের শেষাশেষি হয়। তারপর আমি মাস-

খানেকের জন্যে আমার বন্ধু দীপনারায়ণ সিং-এর কাছে ভাগলপুরে থাকতে যাই। ফিরে এসেও নানা পারিবারিক ঘটনাচক্রে বিবাহ স্থগিত থাকে। অবশেষে ১৮৯৯-এর ফাল্গুন মাসে আমাদের বিবাহ হয়।

এর পরে কায়স্থ বড়মানুষদের গার্ডেন-পার্টিতে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলুম। জাহাজে যে-দুই লোকের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলুম, তাদের টাকা টমাস কুক কোম্পানিতে জমা দিয়ে দিলুম। তাদের ভিতর একজন কলকাতায় এসেছিল এবং তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

আমি বিলেত যাবার পূর্বে কিছুদিনের জন্য অ্যাটর্নির আপিসে আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক ছিলুম। তাই ফিরে এসে ব্যারিস্টারের পুরো ফি দিতে হয়নি। হাইকোর্টে enrolled হবার পর থেকে ব্যারিস্টারই হয়ে রইলুম এবং আজ পর্যন্ত তা-ই আছি। আমি প্রথম-প্রথম বালিগঞ্জ সর্কুলর রোডের একটি ভাড়া-বাড়িতে থাকতুম। তারপর বছর-দেড়েক পরে সেখান থেকে ‘কমলালয়’ নামে নিজের বাড়িতে উঠে গেলুম। যেটা বর্তমানে ব্রাইট স্ট্রিটের মোড়ে নদীয়ার মহারাজার বাড়ি। বহু বৎসর সেইখানেই ছিলুম। কেবল কলকাতায় সুবিধে হবে না ভেবে ১৯০৪ সালে বছরখানেকের জন্যে দার্জিলিঙে বসবাস করতে যাই। সেখানে জলাপাহাড়ের একটি ছোট বাড়িতে বেশ গুছিয়ে বসেছিলুম, এমনকী নেপালি ভাষা শিখতে আর আদালতে যেতেও শুরু করেছিলুম। কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হল বলে ১৯০৪-এর শেষে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলুম। তাঁর এই অসুখের জের অনেক দিন চলে, এবং হাওয়াবদলের জন্য মাঝে-মাঝে তাঁকে শিমূলতলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাতে হত। অবশেষে বাপ-মায়ের সঙ্গে রাঁচি গিয়ে এবং কবিরাজি চিকিৎসা করে তাঁর স্থায়ী উপকার হল।

বাড়ি ভাড়া দিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলুম বলে, ফিরে এসে শ্বশুরবাড়ি ১৯ নং স্টোর রোডেই (অধুনা বিরলা পার্ক) উঠলুম। কিছুকাল পরে আমার সেজদাদা কুমুদনাথ ও ডাক্তার-ভাই সুহৃৎনাথের সঙ্গে একত্রে ২৫ নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে উঠে গেলুম। আমার সেজদাদা তখন নববিবাহিত, স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের মেয়ে রাধারানী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। সুহৃৎনাথের স্ত্রী নলিনী দেবী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার দিদি প্রসন্নময়ী দেবী এবং ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবীও আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন। বাড়িটা বেশ বড় ছিল, এবং আমরা সেখানে ভালোই ছিলুম। তবে বড় পরিবার হলে রোগশোকের অভাব থাকে না। এখানে

থাকতে-থাকতে প্রধান দুর্ঘটনা হল আমার ভাগ্নীর একমাত্র সন্তান তারাকুমারের অকালমৃত্যু। তাতে দীর্ঘকাল আমাদের পরিবারে সকলের মনের উপর ছায়া পড়েছিল। ব্যারিস্টারি আরম্ভ করে অবধি, কতকটা আমার স্ত্রীর অসুখের দরুন, আর কিছুটা নিজের অক্ষমতার দরুন আমার প্র্যাকটিস বেশি হয়নি। কখনও টাকা ধার করতুম, কখনও অন্য কোন কাজ করতুম। প্রথমে ল-কলেজে প্রফেসরি করি। তারপর দক্ষিণেশ্বরের রিসিভরি করি। তারপর আমি গোপাললাল শীল এস্টেটের রিসিভরি পাই। এই সব মিলে আমাদের একরকম চলে যেত। কমলালয় বাড়ির একদিকের অর্ধেক জমি আমার সেজদাদা কিনে নিজের বাড়ি তৈরি করেন। অপর দিকের কিছু জমি ম্যুনিসিপ্যালিটি কিনে নেয়। তাতেও কিছু টাকা হাতে আসে। সে বাড়ি মধ্যে-মধ্যে ভাড়া দিতুম, সে কথাও পূর্বেই বলেছি। কিছুদিন আমি ঠাকুর-এস্টেটেরও ম্যানেজার হই। তাই সব সুদ্ধ নিয়ে সে সময়ে আমার আয় মন্দ ছিল না। আর ১৯১৬ সালে সুহৃৎনাথ যুদ্ধের কাজ নিয়ে বিলেত যান ও তাঁর পরিবারবর্গ আমার কাছে রেখে যান বলে বাড়িতে লোকও মন্দ ছিল না। ১৯১৮-য় তিনি দেশে ফেরেন ও কিছুদিন পরে সপরিবারে অন্য ভাড়া-বাড়িতে উঠে যান। বলতে ভুলে গেছি যে, ইতিপূর্বে বাড়ি মেরামত করতে দিয়ে ১৯১১ সালে আমরা শিলং বেড়াতে যাই। যে-দিন যে-সময়ে ফিরে আসি, ঠিক তার আগেই কমলালয় বাড়ির গাড়িবারান্দা ধ্বসে পড়েছে শুনলুম। সুতরাং সে সময়ে আবার কিছুদিন আমার শ্বশুরবাড়ি ১৮ নং স্টোর রোডে থাকি।

এর আগেই, আমরা যে-রকম বাড়ি পেয়েছিলুম, তার তুলনায় ঘরে-ঘরে পাথর বসিয়ে ও বাইরে ফুল কাটিয়ে তার চেহারায় অনেক উন্নতি করেছিলুম। দেড়তলা বাড়িখানি দেখতেও বড় সুন্দর ছিল। বিশেষত গাড়িবারান্দায় পাথর-বসানো উঁচু সিঁড়ি যেন ছবির মতো দেখাত।

এই কমলালয় বাড়িতে সবুজ পত্রের উদ্‌গম হয়, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। তিনি বিকেলে চরে বেড়াতে যেতেন। এই বোটেতেই মণিলালের কাছে শুনি যে, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে আর লিখবেন না, তিনি ঢের লিখেছেন। তা শুনে আমি তাকে বলি যে, বহু লোক আপনার বয়সে কেবল লিখতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বার করে, তা হলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম, আপনি যদি লেখেন তা হলে আমিও কাগজ

বার করতে রাজি আছি। তিনি বললেন— অন্য কোন কাগজে আমি লিখব না।

মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজ পত্র নামে ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, ১৩২১ সালের বৈশাখে সবুজ পত্র প্রথম বেরোয়।

এই কাগজ উপলক্ষ্য করে যে-সব যুবক কমলালয়ে আমার কাছে আসতেন, তার মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ও তার ভগ্নীপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন। আর ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখুজ্জে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র চাটুজ্জে, অমিয় চক্রবর্তী, বরদাচরণ গুপ্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র ঘটক, মানিকচন্দ্র দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, সোমনাথ মৈত্র প্রভৃতি। এঁরা সকলেই যে সবুজ পত্রে লিখতেন তা নয়, কিন্তু সকলেরই লেখাপড়ার দিকে মন ছিল। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকেই নাম করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ লিখতেন ও আজও লিখছেন। সতীশ ঘটক লিখতেন, কিন্তু অকালে মারা গেলেন। বরদা গুপ্ত দুই-একটি প্রবন্ধ লিখে আর লেখেননি। সুনীতি চাটুজ্জে তাঁর বিলেতের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত এই কাগজে লিখেছিলেন। সে বিষয়ে তিনি আজও লিখছেন। অমিয় চক্রবর্তী তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন, এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের অনেক দিন অবধি পরিচয়। তিনি যখন চিঠি লিখে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসেন, তখন একেবারে একটি বালক দেখব তা ভাবিনি। সেই বয়স থেকেই তিনি চিঠি লিখে দেশবিদেশের লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সুরেশানন্দ আমাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, একটা দূর-সম্পর্কও তার সঙ্গে ছিল। তিনি মাঝে-মাঝে তার বাঙালে ভাষায় কবিতা লিখতেন।

এই সবুজ সভায় সভ্যগণ হপ্তায় একদিন করে আমার কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পরে কখনও সাহিত্যালোচনা, কখনও সঙ্গীতচর্চা হত। শুনতে পাই যে সত্যেন বোস এস্রাজ বাজাতেন, কিন্তু আমি তাঁর এস্রাজ কখনও শুনিনি। মন্টু (দিলীপ রায়) যখন আসত, সে গান করত। বাড়ির মেয়েরাও কখনও-কখনও করত।

লেখবার মধ্যে আমিই নিয়মিত মাসে-মাসে সবুজ পত্রে লিখতুম। আর রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে-কথা দিয়েছিলেন, সে কথা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না-করে সবুজ পত্রের কোন সংখ্যাই বেরোয়নি। এবং তাঁর এই সাহচর্য না-পেলে আমি

যে ছয় মাসও সবুজ পত্র চালাতে পারতুম না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সবুজ পত্র আকারে চৌকোণা ও ছোটই ছিল, আট-ন ফর্মার বেশি নয়। তার মলাটের রং বাস্তবিকই সবুজ ছিল, এবং তার উপরে একটি কালো তালপাতার নকশা থাকত। সেটি নন্দলালের হাতের আঁকা। কাগজ এবং ছাপা ভালোই ছিল। সবুজ পত্র ছবি এবং বিজ্ঞাপন-ছুট ছিল। তদানীন্তন অন্যান্য মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তা-ই ছিল তার প্রধান প্রভেদ। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির রচনায় যাতে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ রক্ষিত হয়, সম্পাদক হিসেবে আমি বরাবর সেই চেষ্টাই করে এসেছি। এবং আজ পর্যন্ত যে সাহিত্যসমাজে সবুজ পত্রের সুনাম আছে, সে ঐ কারণেই।

আমাদের লেখকসংখ্যা অতি কম ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। আমার যত দূর মনে পড়ে, সেকালের প্রসিদ্ধ লেখকের ভিতর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি রচনা বেরিয়েছিল। বাকি অধিকাংশ লেখকই নতুন, এবং সবুজ পত্রের হাতে গড়া। এই লেখক-বলের অভাবে শেষাশেষি সবুজ পত্র নিয়মিত প্রকাশ করতে পারিনি। মণিলাল রবীন্দ্রনাথকে বলে যে, আপনার সবুজ পত্রের লেখার সঙ্গে অন্য লেখার এত তফাত যে অন্য কোন কাগজে আপনার লেখা দিলে তার তেমন সমাদর হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ কথা সমর্থন করেন।

যতদিন সবুজ পত্র বেঁচেছিল ততদিন পর্যন্ত একভাবেই চলেছিল। তারপর গতপূর্ব যুদ্ধের সময়ে জিনিসপত্র সব আক্রা হওয়ায় আমি সবুজ পত্র বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। প্রথম পর্যায় সবুজ পত্র ১৩২১ সাল থেকে ১৩২৮ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে চলে। তারপর ক-বছর বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ পর্যন্ত চালিয়েছিলুম। তারপর আর পারলুম না। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে বছর-আটেক সমানে চলে। দ্বিতীয় পর্যায় আমার জন্মমাস শ্রাবণ থেকে আরম্ভ করি; পর বৎসর ভাদ্র, তার পরের বৎসর আশ্বিনে বেরোয়, তার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই মাসের হেরফেরের দরুন বৎসরেরও হেরফের হয়ে যায়। অর্থাৎ ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪-এর মধ্যে মাত্র দু-বৎসরেরই বেরোয়।

দ্বিতীয় পর্যায় সবুজ পত্রের খরচা সুধীন্দ্র দত্ত দেন। তার থেকেই বোঝা যাবে যে, এত দিনেও সবুজ পত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিছুদিন পর সুধীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেত চলে যান। তারপর তিনি ক্যালিফর্নিয়ায় যান, ক্যানাডাতেও যান। সুধীন দত্ত খরচা দেওয়া বন্ধ করলেন, তাই সবুজ পত্রও বন্ধ হয়ে গেল।

৫

যুদ্ধের পর অকস্মাৎ কলকাতার সব জমি ও বাড়ির দর বেড়ে গেল। সেই সুযোগে আমিও আমার ১ নং ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি করে ফেললুম, মহারাজা-নদীয়ার কাছে। বাড়ি ছেড়ে প্রথম আমার দাদার কুটুম্ব সিলেটের নগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ৭ নং সানি পার্কের বাড়িতে গিয়ে উঠি ও সেখানে সাত মাস থাকি। তারপর মাস-দেড়েক আমার ডাক্তার-ভাই সুহৃৎনাথের ভবানীপুরের বাসায় কাটিয়ে আমার সেজদাদা কুমুদনাথের ২/১ নং ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়িতে আশ্রয় নিই। ইতিপূর্বেই বালিগঞ্জের বর্তমান মেফেয়ার রোডের প্রান্তে একখণ্ড জমি নতুন বাড়ি করবার উদ্দেশ্যে কিনেছিলুম। এবং সুরেন মুখুজ্জে নামক একজন কন্ট্রাক্টর তখন মেফেয়ারের অন্যান্য বাড়ি তৈরি করায় নিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁরই হাতে আমার নতুন বাড়ি নির্মাণের ভার দেওয়া সঙ্গত মনে করলুম। সেজদার বাড়ি থেকে আমি এই বাড়ি তদারক করতে যেতুম। নানা কারণবশত আমার এই বাড়ি (পরে ২০ নং মেফেয়ার বলে পরিচিত) তৈরির সঙ্গে অনেক ঝঞ্ঝাট ও লোকসানের স্মৃতি জড়িত। আমারও হয়তো দোষ ছিল, অন্যেরও দোষ ছিল; সে বিচারে এখন ফল নেই। মোট কথা, 'কমলালয়' ফলক নামে মাত্র নতুন বাড়ির ফটকে শোভা পেলেও প্রকৃতপক্ষে কমলা সেখান থেকেই আমার কাছে বিদায় নিলেন। প্রথমত যখন মহারাজ-নদীয়ার কাছে প্রায় পৌনে-দুই লক্ষ টাকায় পুরনো ১ নং-এর ব্রাইট স্ট্রিটের 'কমলালয়' বিক্রি করি তখন অভিপ্রায় এবং আশা ছিল যে, আমাদের আসবার উপযোগী নতুন একটা মাঝারি গোছের বাড়ি তৈরি করেও যে-টাকা হাতে থাকবে তার সুদে আমরা বুড়োবয়সে ঘরে বসে খেতে পারব। কিন্তু নানা দুর্দৈবে নতুন বাড়ি করতে প্রায় সমস্ত টাকাটাই লেগে গেল। তা ছাড়া পুরনো বাড়ির টাকা পাবা মাত্র একজন নিকট-আত্মীয় সমস্তটা ধার নিলেন বলে, এবং সময়মতো শোধ করতে পারলেন না বলে নতুন বাড়ি তৈরির অনেক টাকাই ধার করে শুধতে হল। এই ধার অধিকাংশ হিন্দুস্তান ইনশিয়োর কোম্পানির কাছ থেকে নিই। পূর্বোক্ত আত্মীয় আমার বাকি পাওনা কতক জমি ও কতক জমিদারি দ্বারা শোধ করেন। সেই জমিদারি বা ধোবরাকোল এস্টেট নদীয়া জেলায় স্থিত। প্রথম কয় বৎসর তার থেকে বেশ আয় হয়েছিল, এবং সংসারযাত্রাও নির্বিঘ্নে চলেছিল। কিন্তু পরে শিকস্তি প্রভৃতি নানা কারণ-সমবায়ে আয় কমে যেতে লাগল।

এদিকে আমার গোপাল শীলের চাকরি গেল, ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের রিসিভরিও গেল। শুধু ল-কলেজের একটা প্রফেসরি রইল। সে সামান্য আয়ে সংসার চালানো দুর্ঘট হল। তাই ক্রমে ২০ নং মেফেয়ারের নতুন বাড়ির বড় অংশটা ভাড়া দিয়ে ছোট অংশটায় নিজেরা থাকতে লাগলুম। ইতিপূর্বে আমার ডাক্তার-ভাই সপরিবারে এসে সেই অংশে ছিলেন। বড় বাড়িতে থাকাকালীন আমার শ্বশুরমহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অনেক দিন আমাদের কাছে এসে ছিলেন, এবং ঐখানেই ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে আমার শাশুড়িঠাকুরানিও আমাদের অনুরোধে রাঁচির একক বাস তুলে দিয়ে আমাদের কাছে বছর-আষ্টেক এসে ছিলেন। বলতে ভুলে গেছি যে, ইতিপূর্বে আমার সেজদাদা কুমুদনাথ পাটনায় প্র্যাকটিস করতে যাবার সময়ে আমার মাতাঠাকুরানিকেও আমাদের কাছে রেখে যান, এবং ১৷৷ বৎসর পরে ফিরে এসে আবার নিয়ে যান। এইরকম করে টাকা-কড়ির দিক থেকে ২০ নং মেফেয়ার অপয়া হলেও অন্য দিকে অনেক গুরুজনের পদধূলিলাভে পুণ্যস্থানে পরিণত হয়েছিল।

যখন ২০ নং-এর বড় বাড়ি ভাড়া দিয়ে ছোট বাড়িতে নিজেরা এসে থাকতে বাধ্য হলুম তখন আমার ডাক্তার-ভাই সপরিবারে অন্য ভাড়া-বাড়িতে উঠে গেলেন। ইতিমধ্যে আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে আমাদের ছোট বাড়িতে দিনকতক থেকে নিজেদের নতুন বাড়ি তৈরির তদারক করেছিলেন। তাঁরাও ঐ যুদ্ধোত্তর চড়া বাজারের লোভে নিজেদের ১৯ নং স্টোর রোডের সুন্দর বাগানবাড়ি অনেক লাভে আমাদের আগেই বিক্রি করেছিলেন। পরে বোলপুর ও কলকাতায় যাতায়াত করে ও কখনও-কখনও আমাদের ১ নং কমলালয়ে থেকে, শেষ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা ভবনে কাটিয়ে তবে নিজেদের পাম প্লেসের নবনির্মিত লালবাংলা বাড়িতে থাকতে আসেন। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমার জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে গ্রথিত হয়েছিল, সুতরাং তাঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও অনিবার্য রূপে জড়িত হয়ে পড়ে।

১৯০৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের উপর যে-বাড়ি এবং তার চূড়ায় যে-মন্দির তৈরি করান সেটি এখনও প্রত্যেক রাঁচি-যাত্রীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে রয়েছে। আমার স্ত্রীর শরীর ওখানে গিয়ে সারে বলে তার আগে থেকেই শ্বশুর-পরিবার এবং সেই সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমরাও রাঁচির ভিন্ন-ভিন্ন ভাড়াবাড়িতে গিয়ে থেকেছি। তাঁদের পাহাড়ের বাড়ি হবার আগের বছর আমরাও রাঁচির কোকোর

নামক পাহাড়ে জমি কিনে নিজেদের একটি বাংলো-জাতীয় একতলা বাড়ি তৈরি করি ও ঘরকন্না পাতবার আবশ্যক জিনিস দিয়ে সাজাই। দুঃখের বিষয়, ১৯১৯ সালে প্রথম গৃহপ্রবেশ করেই আমার স্ত্রী সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময়ে সুহৃৎ সপরিবারে উপস্থিত থেকে সেবা-চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন।

পরের বৎসর এই কোকোর বাংলো তৈরি করতে যত দাম পড়েছিল সেই দামেই একটি মুসলমান নবাবকে জিনিসপত্র-সুদ্ধ বিক্রি করে ফেলি। তার আগে একবার ভাড়াও দিয়েছিলুম। বিক্রি করলুম এই জন্য যে, প্রতি বৎসর পুজোর সময়ে মাসখানেকের জন্য রাঁচি যেতুম কেবল আমার শ্বশুরবাড়িকে দেখবার ও দেখা দেবার জন্য। তাই দূরে বাড়ি করে থাকার কোন সার্থকতা ছিল না, বরং দেখাশোনা-যাতায়াতের অসুবিধাই হত; কারণ এখনকার মতো তখন যানবাহনের এত সুবিধে ছিল না।

আমার মনে আছে যখন আমার শ্যালক-পরিবারের সঙ্গে আমরা ১৯০৮ সালের আরম্ভে প্রথম রাঁচি যাই এবং স্টেশনের কাছে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর মস্ত বাগানওয়ালা বাড়িতে উঠি তখন একটি ভাড়াটে ফিটন কষ্টে যোগাড় করে সান্ধ্য ভ্রমণে চারজনে বার হতুম। নতুন জায়গায় মাঘ মাসে আসবার আগে সেখানকার উৎকট শীতের ভয় অনেকে দেখিয়েছিলেন, যথা ঘরে সারা দিন আঙ্গোটি জ্বালিয়ে রাখলেও সে শীত ভাঙবে না, হাত-পা কালিয়ে যাবে ইত্যাদি। অবশ্য শীত আমরা পেয়েছিলুম স্বীকার করছি, আর বিকেলে গাড়ি করে বেড়াবার সময়ে যখন হু-হু করে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে অবাধে কনকনে হাওয়া বইত তখন খুব যে আরাম লাগত তা বলতে পারিনে; আর যাঁরা আমাদের মধ্যে শীতকাতুরে তাঁরা মাথায় ফ্যাটা বেঁধে বেরতেন। তবে যতটা জুজুর ভয় দেখানো হয়েছিল ততটা কারণ ছিল না; আর সে যাত্রা আমাদের কারও যে অসুখ করেনি, সেইটেই তার প্রমাণ।

এই ১৯০৮ সালে প্রথম রাঁচি যাই, আর তারপরে বোধ হয় প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে প্রতি বৎসর পুজোর সময় মোরাবাদী পাহাড়ের শান্তিধামে গিয়ে থাকি। সে সময়ে সেখানকার আবহাওয়া খুব ভালো থাকে, আর আমরাও তাঁদের আদরযত্নে শরীরে-মনে ভালোই থাকতুম। জ্যোতিকাকা আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আর আমরা তাঁর শান্তিধাম বাড়ির যা-যা উন্নতির পরামর্শ দিতুম, পরের বৎসর গিয়ে প্রায়ই দেখতুম সেগুলি কার্যে পরিণত হয়েছে। ঐ বাড়িটি যেন তাঁর ছেলের মতো ছিল;

কোথায় কী একটু করলে ভালো হবে কেবল তা-ই ভাবতেন। এক-একবার আমার সবুজ পত্রের দলের এক-আধজনও আমাদের সঙ্গে রাঁচিতে ছুটি যাপন করতে যেতেন; তাঁরাও সমান আদরযত্ন পেতেন। আমার শ্বশুর-খুড়শ্বশুরমশায়দের কাছে ছিল বসুধৈব কুটুম্বকং। যত বেশি লোক পাহাড়ের বাড়ি ও মন্দির দেখতে আসত ততই তাঁরা খুশি হতেন ও সকলকে প্রিয়বাক্যে আপ্যায়িত করতেন। পরিবারস্থ লোক ছাড়া রাঁচিতে দু-একজন সাহিত্যিকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়, যথা শ্রীভবানী ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

আমার শাশুড়িঠাকুরানি কিছুকাল পরে পাহাড়ের তলায় মোরাবাদী রাস্তার উপর নিজের খেয়ালমতো একটি আটপৌলে বাংলো তৈরি করেন ও সেখানে তাঁর বড় নাতি সুবীরকে নিয়ে বাস করতে থাকেন, বাড়িটার নাকি পদ্মের মতো গড়ন করাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তাঁর ছেলে পাপড়ির মাথাগুলো কেটে দেবার প্রস্তাব করায় আটপৌলে নকশায় শেষে দাঁড়াল। এই কথা শুনে আমি বলেছিলুম যে, পদ্মে ভ্রমরেরই বাস শোভা পায়, মানুষের বাসের তেমন সুবিধে হয় না। এই বাড়ি ১৯২০ সালের পরে তিনি আমার স্ত্রীকে দান করেন। সে অবধি আমরা যখন রাঁচি যেতুম সেখানেই থাকতুম। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় বোধ হয় ১৯৩৬ সালে সেখানে শেষ নিয়ে যাই, আর তার পরের বৎসর আমরাও শেষ সেখানে বেড়াতে যাই। 'শেষ' এই জন্য বলছি যে গত বৎসর ১৯৪৫ সালে আমরা সেই বহুপরিচিত প্রিয় সত্যধাম বাড়ি (এই নাম শ্বশুরমহাশয়ের ইচ্ছাতেই দেওয়া হয়) বিক্রি করে পরের হাতে তুলে দিয়েছি। কারণ এখন আর আমার অত দূরে যাতায়াত করবার মতো শারীরিক সামর্থ্য নেই।

১৯২৫ সালে জ্যোতিকাকামশায়ের মৃত্যু হয়। তিনি নিজেই নিজের জীবন-স্মৃতি লিখে গেছেন, সুতরাং আমার পক্ষে সে বিষয়ে বেশি কিছু বলা বাহুল্য। তাঁর অর্শ ও হাঁপানি-কাশি, এই দুই পারিবারিক রোগ সঙ্গের সাথী ছিল; তবু অনেক দিন একেবারে একলা কী প্রসন্ন ভাবে ঐ নির্বান্ধব পাহাড়-কুঠিতে চাকর মাত্র সহায় হয়ে কাটিয়েছেন, মনে করলে আমাদের মতো সুখী পরমুখাপেক্ষী মানুষের আশ্চর্য বোধ হয়। চাকরের ঘরও অনেক দূরে, পাহাড়ের নিচের দিকে ছিল, দরকার হলে তাদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতেন। এরকম নিরভিমান, নিরুদ্বেগ, নিরুপদ্রব, নিরতিশয় ভদ্রলোক যে-কোন সমাজেই দুর্লভ। তিনি উইলে তাঁর পাহাড়ের শান্তিধাম বাড়ি সত্যেন্দ্রনাথের বড় নাতি সুবীরকে দিয়ে যান, তাকে ছোটবেলা

থেকেই কাছে পেয়েছিলেন ও খুবই ভালোবাসতেন; তাঁর সমস্ত আঁকবার খাতাপত্র ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথকে, এবং সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতপুস্তক আমার স্ত্রীকে দিয়ে যান। এই দুই শিল্পে তাঁর অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। তা ছাড়া কিছু জমি মোরাবাদীর রাস্তার ওপারে কিনে একটি ছোট বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারেননি। সেটি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছানুসারে শেষ করে পাড়ার গরিবদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার্থে সেবাধাম নাম দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে প্রয়োজনমতো সাজসরঞ্জাম সমেত দিয়ে দেওয়া হয়। এখনও তাঁরা সেটির অধিকারী এবং পরিচালক।

প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল রাঁচিতে বসবাস ও যাতায়াত করে সেখানকার লোকজন, ঘটনাবলীর অনেক কথাই মনে উদয় হয়, কিন্তু সব কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। তাই রাঁচির অধ্যায় এই বলেই শেষ করি যে, সেখানকার স্মৃতি নিষ্কণ্টক সুখের বলেই মনে রয়েছে, কেবল আমার স্ত্রীর ঐ এক ভারি ব্যারাম ছাড়া। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী অশোকা দেবী আমাদের সত্যধামের অনেকটা জমি কিনে নিয়ে নিজে রাঁচিতে বেশ ভালো বাড়ি তৈরি করে গত যুদ্ধের সময় থেকে সেখানেই সপরিবারে বসবাস করছেন এবং যত দিন আমাদের বাড়ি ছিল তার তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমার দাদার ছোট ছেলে দেবকুমারও রাঁচিতে মোরাবাদীর কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করেছেন। দুঃখের বিষয় তাঁরা যখন রাঁচিতে স্থায়ী হলেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা সেখানকার বাস তুলে দিয়ে চলে এলুম।

৬

যদিও আমার শ্বশুরবাড়ি রাঁচি থাকাকালীন প্রায় প্রত্যেক বৎসর পুজোর সময় রাঁচিতে বেড়াতে গেছি, তবে অন্যত্র একেবারেই যে যাইনি তা নয়। একবার শিলং যাবার কথা আগেই বলেছি। সেখানকার লাল মাটির পাহাড়ে রাস্তা ঘুরে-ঘুরে ওঠা আর নির্জন সুন্দর হোটেল-সংলগ্ন স্থানে মাসখানেক নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ভালোই লেগেছিল। শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর

পর ১৯২৬ সালে একবার গ্রীষ্মকালে আমার ছোট ভাই অমিয়নাথের সঙ্গে তাঁর দার্জিলিঙের বাড়ি Wigwam-এ গিয়ে থাকি। এবং তারপর দুই বৎসর উপরি-উপরি Maples ও Caroline Villa নামক সেখানকার বোর্ডিং হাউসে গিয়ে থাকি। এই প্রকার পরহস্তগত গৃহস্থালিতে থাকলে নিজেদের ঘর-সংসার করবার ল্যাঠা থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে; অপর পক্ষে তাদের নিয়মকানুনের কতকটা অধীন হয়ে পড়তে হয়। তবে আমাদের সে জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। Maples-এ বেশ সুন্দর ঘর পেয়েছিলুম, আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গও পেয়েছিলুম, আর Caroline Villa-য় একটি মেমের সাক্ষাৎ পাই তাঁর নাম Mrs Laura Finch. তাঁর সঙ্গে আলাপটা অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর জীবনের ঘটনা যেন ঠিক একটি উপন্যাসের মতো। তখন তিনি আধা-বয়সী হলেও তাঁর সুদীর্ঘ ঋজু দেহ এবং সুরুচিসম্মত পরিচ্ছদের বিশেষত্বে পূর্বের সৌন্দর্য এবং অভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশ পেত। তিনি হিন্দু ধর্ম ও দর্শন আলোচনার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন, কিন্তু বলতেন যে অনেক অনুসন্ধানেও উপযুক্ত গুরুর দর্শন মেলেনি। অবশেষে বহু চেষ্টার পর হাবড়ায় বিজয়-কৃষ্ণ শর্মাকে গুরুদেব বলে মেনেছিলেন, যিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। একবার তাঁর সঙ্গে আমরাও গুরু-সন্দর্শনে যাই, কিন্তু একদিন দু-দশ মিনিটে আর কী পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। Laura Finch বিখ্যাত ফরাসি প্রেততত্ত্ববিৎ Professor Richet-এর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে বহু প্রেতচক্রে যোগদান করেছেন। সে সব গল্প যেমন আশ্চর্য তেমনি চিত্তাকর্ষক। বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা নেই, জানিনে এখনও ইহলোকে আছেন কি না, বা তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কি না! এর পরে আর দার্জিলিঙে যাইনি, খুব সম্ভব আর যাওয়া হবেও না। যুবাবয়স থেকে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত কত রকম স্মৃতিই না এই শৈলনিবাসের সঙ্গে বিজড়িত।

বিবাহের পরেও আমি বার-দুই সিমলা পাহাড়ে গেছি। একবার আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে সেখানে রাজা হরনাম সিংদের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকি— যে-Manor Lodge-এ এখন তাঁদের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী অমৃত কুমারের আতিথ্য গ্রহণ মহাত্মাজি প্রায়ই করে থাকেন। আমি যে-বছর বিলাত যাই (১৮৯৩ সালে) সেই বৎসর আমার শ্বশুর-পরিবার একাদিক্রমে আট মাস সিমলা শৈলে বাস করেন ও সেই সময়ে হরনাম সিংদের পরিবারের সঙ্গে যে-বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তা রাজা-রানির

জীবিতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এবং রানিসাহেবাকে বিবাহ করবার জন্য তখনকার কপূর্রতলার গদির অধিকারী কুমার হরনাম সিং কেমন করে খ্রিস্টান হন ও গদির দাবি পরিত্যাগ করেন, সে-ও এক গল্পবিশেষ। আর-একবার যাই বেড়াতে আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোধ হয় ১৯১৭ সালে। পাহাড়ের কথা যখন হচ্ছেই, তখন কার্শিয়ং কিছু নিম্ন স্তরের হলেও তার উল্লেখই বা ছাড়ি কেন। সেখানেও দু-বার যাই— একবার আমার শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে অনুমান ১৯১৬ সালে। আর-একবার আমার ডাক্তার-ভাই সুহৃৎ যখন যুদ্ধের কাজ নিয়ে বিলেত যান তখন তাঁর পরিবারকে হাওয়াবদলের জন্য নিয়ে গিয়ে হাত্রাসের রাজার বাড়িতে মাসখানেক থাকি।

কার্শিয়ঙেরও নিচে টিত্তারিয়া পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক কারণে বিশেষ যোগ ছিল। দাদা সেখানে এক সাহেবের কাছ থেকে একটি ছোট বাংলো ও চা-বাগান ৭০০০৲ দিয়ে কেনেন। পরে প্রায় ৩০,০০০৲ খরচ করে সেটাকে রীতিমতো দোতলা বাড়ি করে তুলে এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়েছিলেন যে দেখলে চেনা যেত না। তাঁর প্রতি ছেলেমেয়ের নামে-নামে ঘর ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সেটা নামেই রয়ে গেল, কারণ অমন নির্জন ছোট পাহাড়ে জায়গায় তারা কে থাকতে যাবে। আমরা দু-তিন বার গিয়ে সেখানে থেকেছি। একবার আমার শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে। সে বার মনে আছে আমার স্ত্রী এবং জ্যোতিকাকামশায় গোপেশ্বরবাবুদের সঙ্গীতমঞ্জরীর স্বরলিপি দেখে-দেখে কত সুন্দর-সুন্দর হিন্দি গান গাইতেন, যা পরে বাংলায় ভাঙা হয়েছিল। আমি চিরকালই হিন্দি গানের ভক্ত, এবং অল্পবয়সে কিছু-কিছু গাইতেও পারতুম।

দাদা পুরীতেও একটা বাড়ি করেছিলেন। যা পরে বিক্রি হয়ে যায়। আমরাও একবার পুরীতে গিয়ে অন্য বাড়িতে কিছুদিন ছিলুম। আমার স্ত্রীর অসুখের দরুন বিয়ের অল্পদিন পরে শিমূলতলায়ও দু-বার হাওয়াবদলে গিয়েছিলুম। বিয়ের পরের পুজোর ছুটিতেই কাশী যাই আমার ছোট ভগ্নীর কাছে বোধ হয় ১৯১৪ সালে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের হরধাম বাড়িতে।

১৯২২ সালে আমার বৌঠাকরুন প্রতিভা দেবীর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়। দাদা তাঁকে ১৮৮৬ সালে বিয়ে করে আনবার পর থেকেই ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। মট্‌স লেন-এর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ও দাদার সঙ্গে কবিতালোচনার কথা আগেই বলেছি। বৌঠান হিন্দি গান অতি সুন্দর গাইতেন এবং বিয়ের পর

পর্যন্ত তার চর্চা রেখেছিলেন বলে আমিও শুনে আনন্দ পেতুম। পরে নিজে গানবাজনার সাক্ষাৎ চর্চা ছেড়ে দিলেও প্রথমে আনন্দসভা নামে তাঁদের বালিগঞ্জের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য এক সঙ্গীত সভা স্থাপন ও ক্রমশ সেটাকে সঙ্গীত সংঘ নামে এক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পরিণত করার দরুন জীবনের শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে সঙ্গীতের আবহাওয়া বহমান রেখেছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের সাধ্যমতো সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। দাদা নিজে ঠিক সঙ্গীতজ্ঞ না-হলেও সঙ্গীতজ্ঞ গুণীদের বাড়িতে এনে গানবাজনা শোনা ও শোনানোর প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। দাদার মতো ওরকম সামাজিক প্রকৃতির গুণগ্রাহী মজলিশি লোক এ কালে দুর্লভ। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না-পেলে বৌঠান একলা কিছুই করে উঠতে পারতেন না। তাঁদের বাড়িতে কৌকভ খাঁ সরোদি ও দর্শন সিং তবলচির যে-প্রতিযোগিতা চলত তা একটা দেখবার ও শোনবার মতো জিনিস। বৌঠানের অভাবে ওদিকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, শুধু তা-ই নয়, দাদাও অপেক্ষাকৃত কমবয়সে নানা প্রকার রোগে ভুগে অবশেষে চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ১৯২৪ সালে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির সে শ্রী রইল না। ছেলেরাও অত বড় বাড়ি রাখতে পারলে না। অবশেষে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে ফেলে তারা এখন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দাদার অমন সুন্দর লাইব্রেরির একাংশ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমার ফরাসি বইও উক্ত বিদ্যালয়ে দান করার দরুন দুইয়ে মিলে আমাদের পিতৃদেব দুর্গাদাস চৌধুরীর নামে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরি সেখানে স্থাপিত হয়েছে। আমার ইংরেজি বই আমি দু-বার করে বিশ্বভারতীতে দান করেছি। প্রথম বার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, এবং বই পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন ও তাঁর খাসকামরায় স্থান দিয়েছিলেন, সে কথা 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশ। পরে তাঁর অবর্তমানে সম্প্রতি আমার বাকি ইংরেজি এবং বহু বাংলা-সংস্কৃত বই যা এযাবৎ আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের হেপাজতে ছিল সে সব বিশ্বভারতীতে আবার পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি অন্যান্য ছোটখাটো গ্রন্থাগারে কত সময়ে অনুরোধে পড়ে কত বই দান করেছি তা হিসাব করলে বোঝা যায়, এ দীর্ঘ জীবনে কত না বই সংগ্রহ করেছিলুম। এখন ৭৮ বৎসর বয়সে আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, চশমা লাগে না, তাই ভালো পড়তে বা লিখতে পারিনে। কিন্তু মনে এই একটা সন্তোষ রইল যে, আমি যেমন চিরকাল ভালোবেসে বই কিনেছি ও পড়েছি তেমনি অন্যান্য সম্পত্তির মতো ছত্রভঙ্গ না-করে

অন্তত সৎপাত্রে দান করতে পেরেছি। এমনকী রাঁচিতে আমার শাশুড়ি-ঠাকুরানির বাড়ির সঙ্গে যে-দুই আলমারি বই পেয়েছিলুম, তা-ও সত্যধাম বিক্রি হবার পর সেখানকার এক আত্মীয়ের লাইব্রেরিতে দান করে দিয়েছি। দাদা বাবার নামে পাবনায় একটা টোল স্থাপন এবং হরিপুরের বাড়িতে একটি বৈঠকখানা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী বরাবর বলেন যে, আমরা সাত ভাই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে সকলেই কমবেশি যে-পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করেছি, সে অনুপাতে দেশে কোন মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারিনি, যেমন অন্য অনেকে করেছেন। ডাক্তারখানা ও ইস্কুল স্থাপন করবার চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু যে-কারণেই হোক সে চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। ভাইদের মধ্যে কেবল মেজদাদাই (যোগেশচন্দ্র) হরিপুরে নিজের আলাদা বাড়ি করেছেন। আর সেজদাদা (কুমুদনাথ) যত দিন বেঁচেছিলেন তিনিই বোধ হয় দেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক রেখেছিলেন। তাঁর শিকারের নেশা তার একটি, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আমার মা শেষজীবন সেজদার বাড়িতেই কাটিয়েছেন বলে হরিপুরের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় এলে সেজদার বাড়িতে ওঠাই স্বাভাবিক মনে করত। এই রকম করে আমাদের নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ হরিপুরের বড়-তরফের ছেলেরা একাদিক্রমে বহুদিন সেখানে থেকেছে; ছোট-তরফও বাদ যায়নি। তা ছাড়া মেজদার বাড়িও সর্বদাই দেশের আত্মীয়স্বজন বছর-বছর থেকেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে এ নিয়মটা আমাদের বাড়িতে এতটা চলে এসেছে যে, আমরা এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে আর হরিপুর যাইনি; দুঃখের বিষয় নানা ঘটনাচক্রে আমার স্ত্রীকেও সেখানে কখনও নিয়ে যেতে পারিনি, যদিও একবার যাবার সমস্তই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তবে দেশের ছেলেদের উল্লিখিত আনাগোনায় তাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা স্নেহের সম্পর্ক রয়ে গেছে; যদিও দিন-দিন দূরে পড়ে যাচ্ছি। আমার ভিন্ন-ভিন্ন বাড়িতেও অনেক সময়ে অনেক দিন ধরে দেশের নানা দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন বাস করেছে। তবে দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত কাউকে রাখতে পারিনি, তা না-হলে আমার এই নিঃসন্তান অসহায় বৃদ্ধ বয়সে অনেক সহায়তা হত। আমার কাছ থেকে কেউ তেমন কৃতীও হতে পারেনি; যেমন দাদাদের বাড়ি থেকে হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, সুধীর রায়চৌধুরী নামে আমার মামাবাড়ির একটি ছেলে ম্যাট্রিক দেবার পর থেকে আমাদের কাছে এসে

ছিল; অবশেষে তার মাথাখারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে আবার পোরজনায় তার মামার বাড়ি ফিরে পাঠাতে হল। ছেলেটি দেখতে-শুনতে, ব্যবহারে সব দিকেই ভালো ছিল। সে আমাদের কাছে থেকে আই এ পর্যন্ত পড়েছিল কিন্তু পাশ করতে পারেনি। তারপর তাকে হিন্দুস্তান ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিতে কাজও করে দিয়েছিলুম। কেন যে তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হল, তা বলতে পারিনে। সে আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল, এবং আজ থাকলে আমাদের অনেক উপকার হত, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, তাঁরও যে তাকে নিয়ে কী কষ্ট, সে বলবার নয়।

আমার পরবর্তী ভাই মন্মথ পলটনের ডাক্তার হয়ে কিছুদিন সার্জন-জেনারেলের পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা বোধ হয় আর কোন ভারতীয়ের ভাগ্যে ঘটেনি। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছায় আরামের চাকরি ছেড়ে মধ্য-এশীয় রণক্ষেত্রে প্রভূত কষ্ট সহ্য করেছেন। সে জন্য আমার দুই ডাক্তার-ভ্রাতারই কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। মন্মথের পৈতের সময়ে আমি তার কানে মন্ত্র দিই, সে জন্য সে মজা করে আমাকে গুরু বললেও আমাদের যথার্থই ভালোবাসত, এবং প্রতি বৎসরই ভাইদের দেখবার জন্য মাদ্রাজ থেকে ছুটে আসত। আমার দুই ছোটভাই সুহৃৎ এবং অমিয় আমাদের থেকে একটু স্বতন্ত্র ভাবে মানুষ হয়েছে। কারণ তারা বড় হতে-হতে আমরা মফস্বল ছেড়ে শহরে এসে বাস করি এবং দেশের সঙ্গে, দেশাচারের সঙ্গে অনেক পরিমাণে বিযুক্ত হয়ে পড়ি। আমার বড়দিদি প্রসন্নময়ী দেবী ও ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবী লেখিকা হিসেবে অনেকের নিকট পরিচিত। আমার ছোট ভগ্নী মৃণালিনী দেবী এখনও জীবিত; ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল।

কথায় বলে মানুষ একা আসে, একা চলে যাবে। কিন্তু মধ্যখানে পৃথিবীতে বাসকালীন যে-আত্মীয়বন্ধুর পরিবেশে তার জীবন অতিবাহিত হয়, তাদের সঙ্গে তার আত্মকথা নানা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত হয়ে পড়ে। তাই আমার পরিবারের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে করলুম।

চিরদিন মানুষের সমান যায় না। আমরা ভাইরাও বেশির ভাগ বালিগঞ্জ অঞ্চলে নিজেদের বাড়ি করে যে-সুখের সংসার পেতেছিলুম, তাতে ক্রমে ভাঙন ধরতে লাগল। দাদার পরেই বোধ হয় ১৯২৮ সালে মন্মথ হঠাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে মসুরী পাহাড়ে মারা গেলেন। তার আপনার ভাইরা সে সময়ে কেউ কাছে ছিল না, সুহৃৎও খবর পেয়ে গিয়ে তাকে দেখতে পায়নি। এইখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না

যে, কী স্বদেশে কী বিদেশে যে যখন বিপদে পড়েছে, তখনই আমার ডাক্তার-ভাই সুহৃৎ সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে নীরবে তার প্রাণপণ সাহায্য করেছেন।

আমাদের ভাইদের মধ্যে আবাল্য সম্প্রীতি ছিল, এবং কলকাতায় বাস করতে এসেও কাছাকাছি বাড়িতে থাকার দরুন ছেলেদের মধ্যেও ছেলেবেলায় ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন অবশ্য ক্রমে দূর পড়ে যাচ্ছে।

সেজদাদা ও আমি পিঠপিঠি ভাই হলেও ছেলেবেলা থেকে যুবাবয়স পর্যন্ত আমাদের দু-জনের খুব ভাব ছিল। পূর্বেই বলেছি আমার কমলালয় বাড়ির প্রায় অর্ধেক জমি কিনে তিনি নিজের একটি সুন্দর বাড়ি ২/১ নং ব্রাইট স্ট্রিটের ঠিকানায় তৈরি করেন। তাই তার ছেলেরা সর্বদাই আমাদের বাড়ি যাতায়াত করত। এবং তাঁর ছোটছেলে কালীপ্রসাদ বছর-এগারো বয়স পর্যন্ত অনেক সময়ে আমাদের কাছেই থাকত এবং লেখাপড়া ও খেলা করত। সে যে কী সুন্দর ছেলে ছিল এবং আমরা তাকে কত ভালোবাসতুম তার পরিচয় আমার লেখাতেই আছে। তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ জনপ্রিয় যুবাও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার বাপের অবর্তমানে উড়োজাহাজের কী মোহই যে তাকে পেয়ে বসল। বিলেত গিয়ে ভালো করে শিখে আসবে বলে সেই যে হাসতে-হাসতে ১৯৪০ সালে 'টুপ করে ঘুরে আসি' বলে চলে গেল, আর ফিরে এল না। এই কালযুদ্ধে অকালে ভরাযৌবনে অনর্থক বিদেশে প্রাণটা খোয়ালে। কত লোকেরই এই যুদ্ধে সর্বনাশ হয়েছে, শুধু আমাদের একার নয়। তার বাপ থাকলে হয়তো যেতে দিতেন না। সেই অবধি আমারও জীবনের রস শুকিয়ে গিয়েছে। সে আমাদের ছেলের মতোই ছিল, তার দাদা কল্যাণকুমারও সংসারী হল না, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে বসে আছে। সুতরাং সব থাকতেও সেজদাদার অমন সুন্দর বাড়ি নিরানন্দ পুরী হয়ে রইল। তিনিও অকস্মাৎ কালিমাটিতে বুড়োবয়সে শিকার করতে গিয়ে এপ্রিল ১৯৩৪ সালে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারালেন। শরীর ক্রমে দুর্বল হচ্ছে দেখে লোকে তাঁকে কত বারণ করত যেন আর শিকারে না-যান। কিন্তু যার যা নেশা তা কারও কথায় কেউ ছাড়ে না। এখন মনে হয় ভালোই হয়েছে, পুত্রশোক তাকে পেতে হল না। তিনি কত শিকারি যুবা-বন্ধুকে যে-কাজ না-করতে শতবার উপদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ আহত জন্তুকে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করা, অবশেষে নিজেই কার্যকালে সেই উপদেশ লঙ্ঘন করলেন। একেই বলে নিয়তি। এখন আমরা সাত ভাইয়ের মধ্যে চারজন আছি।

আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কয়েক বার সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি

হয়ে গেছি। বোধ হয় ১৯২৮ সালে দিল্লি প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনে যাই। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও ছোট ভগ্নী মৃণালিনী ছিলেন। তিনি এই সুযোগে টাঙায় ঘুরে-ঘুরে সমস্ত দিল্লি শহরের দ্রষ্টব্য দেখে বেড়ান অসিত হালদারের সঙ্গে। আমরা নানান সভাসমিতির হ্যাপায় পড়ে তত দূর পারিনি। পথের মধ্যে এলাহাবাদ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের সঙ্গ ধরেন। আমরা যাবার আগের দিনই বোধ হয় শ্রদ্ধানন্দ স্বামীকে খুন করা হয়, এবং সেই দিনই ধুম করে তাঁর শবযাত্রা হয়, তা-ই নিয়ে খুব গোলমাল চলছিল, এবং কোন-কোন শাখা-সভাপতি উপস্থিত হতে পারেননি। এখানে আসবার আগেও লোকে খুব শীতের ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু আমরা কোন কষ্ট পাইনি। তার পূর্বে মেদিনীপুরে ও শান্তিপুরে এবং পরে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনে এই সেদিন সস্ত্রীক গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ থাকতে চন্দন-নগরের সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার কথাও ভোলবার নয়। যেখানে গেছি আদরযত্ন পেয়েছি। এই সুযোগে আমাদের পুরনো কৃষ্ণনগরের বাড়ি-বাগান আমার স্ত্রীকে দেখাই। সেখানে সপরিবারে কত দিন কত সুখে কাটিয়েছি; কিন্তু এখন দেখলুম বাড়ির ভগ্নদশা। পরে আমরা থাকতে-থাকতেই নদীয়ার মহারানি সেটি কিনে তাঁর গুরুভগ্নী সিস্টার সরস্বতীকে মাতৃসদন করবার জন্য দান করেন। আমাদের সামনেই সমারোহপূর্বক সেই দান-সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানিনে সিস্টার সরস্বতীর অবর্তমানে এখন তার কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের এক অংশে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সে বাড়িঘরও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এবং উচ্চতায় একটা দেখবার জিনিস। এই সেদিন কলেজের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পুরনো ছাত্র হিসাবে আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল।

৭

আগেই বলেছি যে, সময়মতো আমার পূর্ববাড়ি বিক্রির টাকা ফেরত না-পাবার দরুন ২০ নং মেফেয়ারের বাড়ি তৈরি করবার জন্য হিন্দুস্তান কোম্পানির কাছে সেই বাড়িই বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে বাধ্য হই। যত দিন ধোবরাকোল এস্টেটের বাঁধা আয় হাতে আসছিল, তত দিন

তাঁদের সুদ যোগাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু নানা কারণে ধোবরাকোলেরও আয় কমে আসতে লাগল; এমনকী সদর খাজনা যোগাবার জন্য এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হত। তার উপর আমার রিসিভরি-দুটো হাতছাড়া হওয়ায় একমাত্র আয়ের পথ বাকি রইল ল-কলেজের অধ্যাপনা। বিলেত যাবার দরুন কিছু ধার ছিল, এই আয় থেকে তার সুদ যুগিয়ে তার উপর সংসার-খরচ চালানো সম্ভব হত না, যতই ব্যয়-সংকোচ করি না কেন। তাই উত্তরোত্তর ধার বেড়েই যেতে লাগল। ক্রমে রাঁচির বাড়িও হিন্দুস্তানের কাছে বাঁধা পড়ল।

এ অবস্থায় ২০ নং মেফেয়ারের ছোট বাড়িটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম। সেটা হিন্দুস্তান পরে আমার ডাক্তার-ভাই সুহৃৎকে ভাড়া দেয়। আমরা সেজদার বাড়ি উঠে গেলুম এবং আমার শাশুড়িঠাকুরানি সামনেই তাঁর ছেলের বাড়িতে থাকতে গেলেন। সেটা বোধ হয় ১৯৩৩ সালে হবে। সেজদা যে কত আদর করে, ফটকে মঙ্গলঘট স্থাপন করে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা কখনও ভুলব না। এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যখন আমার ১ নং কমলালয় বাড়ি বিক্রি হয়, তখন দাদাও তাঁর ওখানে আমাদের গিয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। যদিও আমরা যাইনি, কিন্তু বিপদের সময়ে আত্মীয়বন্ধুর সহানুভূতি পেলে চিরদিন মনে থাকে।

এই সময় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস কোন কারণ না-দেখিয়ে আমাদের ধোবরাকোলের মাসহারা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছিল। কেন জানিনে, তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর অত্যন্ত বীতরাগ ছিলেন। সে সময়ে আত্মীয়বন্ধুর সদয় সাহায্য না-পেলে কী করে যে দাঁড়াতুম, তা বলতে পারিনে।

সেজদার বাড়ি থাকতে-থাকতে সুহৃদের ছোট মেয়ে পূর্ণিমার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে সুবীরেন্দ্রর বিয়ে হয় ১৯৩৩-এর ডিসেম্বর মাসে। সেজদাদা নিজে বসে কন্যা সম্প্রদান করেন। কে জানত যে চার মাস যেতে না-যেতে পরবর্তী এপ্রিলের প্রথমেই তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে যাবেন। সে ঘটনার উল্লেখ আগেই করেছি।

পু স্ত ক প্র স ঙ্গ

বই হিশেবে 'আত্মকথা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং তা প্রকাশ করেছিলেন দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড-এর পক্ষে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল, এ বই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তিন বৎসর আগে। বলা হয়েছিল, প্রকাশিত 'আত্মকথা'য় লেখক তাঁর বিলেত পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত এক পর্যায় লিখেছেন, অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায় পরে প্রকাশ হবে এমন আশা করা যেতে পারে।

কিন্তু 'আত্মকথা' যে-বছর বই হিশেবে বেরোয়, অর্থাৎ ১৯৪৬-এর জুন মাসে, সে বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রমথ চৌধুরী মারা যান। ফলে প্রকাশকের আশা পূর্ণ হয়নি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে আত্মকথা প্রথমে 'রূপ ও রীতি' এবং পরে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। 'বিশ্বভারতী'তে বেরিয়েছিল মাত্র দুটি সংখ্যায়— ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্রে। তারপরও প্রমথ চৌধুরী 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' সম্পাদনা করেছেন, অন্য প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু কেন যে তাঁর আত্মকথার জের আর টানেননি, তা অজ্ঞাত।

তাঁর মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সৌজন্যে 'আত্মকথা'র নতুন কিছু অংশ প্রকাশিত হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে, 'পূর্বাশা'র অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র সংখ্যায়। সে সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী সম্পাদককে জানিয়েছিলেন, ". . . কতকাংশ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে জুড়ে একরকম শেষ করে দিয়েছি। যদিও অসমাপ্ত ঠিকভাবে সমাপ্ত হয় না। বিশেষ বিলাত প্রবাসের মত প্রধান অংশ অসাবধানতাবশতঃ নিরুদ্দেশ হওয়ায় সমস্ত জিনিসটাই শুধু শেষে নয় মাঝেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল— সে দুঃখ আমার কোনদিন যাবে না।. . . তোমাদের কাগজটি বেশ রুচিসম্পন্ন বলে তাতে 'আত্মকথা'র শেষাংশ ছাপানোয় আমিও খুশি হয়েছি। যদিও প্রথম প্রকাশিত খণ্ডের

সঙ্গে একত্র করে সবটা ছাপতে পারলে আরও খুশি হতুম। তোমরা ইচ্ছা করলে শেষে 'অসমাপ্ত' কথাটা বসাতে পার।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আত্মকথা' এবং পরে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'আত্মকথা'র শেষাংশ— সবটা একত্র করে এই বই। অসমাপ্ত-ই। এ লেখা শেষ তো হয়ইনি, মাঝের কিছু অংশও স্পষ্টত হদিশহীন। এমনকী এর বাইরেও প্রকাশিত আরও কিছু অংশ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা এখনও তার খোঁজ পাইনি। ফলে আপাতত, এই খণ্ডিত 'আত্মকথা'রই পুনঃপ্রকাশ চেয়েছি আমরা।

'আত্মকথা' নতুন করে প্রকাশিত হয়েছিল এর লেখকের জন্মমাসে, এমনকী তাঁর জন্মদিন, ৭ অগস্টে। এ সমাপতনের পেছনে আমাদের কোন সচেতন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এ-ই তো ঠিক— লেখকের জন্মদিনই তো বইয়ের জন্মদিন।

এ বইয়ের প্রস্তুতিতে বহুজনের সহায়তা আছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য শ্রীসত্যব্রত ঘোষালের কথা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি গ্রন্থাগারিক। 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত 'আত্মকথা'র অংশ তিনি আমাদের লিখে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবোধ নন্দীর নামও একই রকম উল্লেখ্য— বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আত্মকথা' আমরা লিখে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রীসমু ভট্টাচার্যের সৌজন্যে। এ জন্য শ্রীসুজিত লাহিড়ীর কাছেও আমরা সমান কৃতজ্ঞ। অনুলিখনের সমস্ত কাজই করেছেন চিত্রভানু চক্রবর্তী, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। এ ছাড়া আরও অনেকের নীরব অবদান আছে এ বইয়ের পেছনে, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।